শান্তিনিকেতন

(দশম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা।

১৩১৫

প্রকাশক

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই যে শান্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠ্‌চে এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কি চেয়েছিল এবং কি পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড় বড় রাজা তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা খোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়। এমন

অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর, এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্ত্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি!

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিষ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে যে ফলটি ধরে, সে এই সমস্ত জিনিষ থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্যে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চারদিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সহ্য

করতে হয় নি। —এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্ত্তি ধরে আপনা আপনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য্য, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে— এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুধাগন্ধ, এমন একটি মধুসঞ্চয়। এই জন্যেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ যেমন সহজ যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কি? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারদিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্ম্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারার আবর্ত্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোট বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণগন্ধ ফুল ফল নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়—কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব্ব হয়ে থাকতে হয় না।

চারদিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্চে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্চে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্চে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, সেই নিভৃতে সেই নির্জ্জনে—সেই বনের মর্ম্মরে, সেই পাখীর কূজনে, সেই উদার আলোকে সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সঙ্গমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করচে সে আমাদের পিতামহেরা আর্য্যাবর্ত্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্ব্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ

করেছেন—এই যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো দুই ভাই-বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করচে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটীর নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করেচেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্ব্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষিপিতামহেরা এই অন্তরিক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্চে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী! পিতানোঽসি, পিতানোবোধি, নমস্তেঽস্তু—এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ. এবং কত পুরাতন। যে ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ

প্রচলিত নেই কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে . নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই ক'টি মাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই অত্যন্ত ছোট অথচ অত্যন্ত বড় কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্ব্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অনন্তের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—এত বড় প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিন-কার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণ দ্বারাও আজ স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্য্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

একদিকে এই পুরাতন আকাশ, পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবন-বিকাশের নিত্য নূতনত্ব, আর একদিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী, এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত—এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র—সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি—ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্ক-লোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করচে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করচে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে

বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।

যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষাব মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করচে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, বরেণ্যং ভর্গঃ, সেই বরণীয় তেজকে ধ্যানগম্য করে তুলচে।

এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র—কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন

এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়—হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারম্ভে কি অসহ্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের? চারদিকে তিনি কোন্ জিনিষটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না? যখন আকাশের আলো তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠেছিল—যখন তাঁর পিতৃগৃহের অতুল ঐশ্বর্য্যের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গৌরব তাঁর মনকে কোনোমতেই শান্তি দিচ্ছিল না তখন তাঁর যে কি প্রয়োজন, কি হলে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে তা তিনি নিজেই বুঝ্‌তে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অরুচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অন্বেষণ করছিল; কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভুলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মত সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা অর্চ্চনা নিয়েই ত দিন কাটিয়েছেন—তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্ম্মের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল তখন এই অভ্যস্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপৃত করে রাখবার উপকরণ ত তাঁর খুব নিকটেই ছিল!

তাঁর ভক্তিকে যে এইদিকে তিনি কখনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবী

মন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভুলতেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে সহরে গাঁদা ফুল দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশান ঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁহার চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল সেদিন এই সকল চিরাভ্যস্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁর তৃষ্ণার জল যে এদিকে নেই তা বুঝ্‌তে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয়নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেননি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাখে কার সাধ্য! যারা নানা ক্রিয়াকর্ম্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখ্‌তে চায় তাদের নানা উপায়

আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ্য মেলে—কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের ত ঐ একটি বই আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে? তাদের সাম্‌নে কোনো রঙীন্ জিনিষ সাজিয়ে তাদের কি কোনো মতেই ভুলিয়ে রাখা যায়? নিখিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে!

কিন্তু এই অধ্যাত্ম লোকের এই বিশ্ব-লোকের মন্দিরের পথ তাঁর চারদিকে যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারিদিকে প্রচলিত ছিল, এই নির্ব্বাসনের মধ্যে থেকেই ত তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল—তাঁর আত্মা যে আশ্রয় চাচ্ছিল—সে আশ্রয় বাইরে খণ্ডতার রাজ্যে সে কোথায় খুঁজে পাবে?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখ্‌তে হবে, এই কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্যে? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোট্‌বার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে, যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে, তাকে সে আর খোঁজেই না; তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে

না ; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিষ বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারেনা।

মেলার দিনে ছোট ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চারদিকে —এই জন্যে মুঠো কখন্ সে ছেড়ে দেয়—তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলি সে বাইবে থেকে বাইরে দূরে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না—বাইরের যে সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেইগুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড় হয়ে ওঠে ; যে মা তার সব চেয়ে আপন, তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াময় সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিষের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায় কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক এক জন মহাপুরুষ জন্মান যাঁরা সেই অনেকদিনকার হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিকের জন্যে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জন্যে চারদিকের কারো কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জন্যে তাঁদের কান্না কোনোমতেই থাম্‌তে চায় না। তাঁরা একমুহূর্ত্তে বুঝ্‌তে পারেন আসল জিনিষটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে না—সেইটিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ অথচ কেউ তার কোনো খোঁজ করচে না; জিজ্ঞাসা করলে, হয়, হেসে উড়িয়ে দিচ্চে, নয়, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আস্‌চে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য, যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজ, তাকে তিনি শক্ত করে

তুল্‌তে দেন—যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেল্‌তে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখ্‌তে পাওয়া যায়—পাছে খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্য্যটি আমরা না পাই। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মত এত সহজ আর কি আছে, তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়ে সহজ—তবু তাঁকে আমরা হারাই—সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—এই যে এইখানেই!—আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি, কই কোথায়?—এই যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই যে আত্মার আত্মায়!—যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়ই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই, এই যিনি অত্যন্তই আছেন তাঁকেই

খুঁজে পাবার জন্যে এক এক জন লোকের এত কান্নার দরকার। এই কান্না মিটিয়ে দেবার জন্যে যখনি তিনি সাড়া দেন তখনি ধরা পড়ে যান—তখনি সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এই রকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউবা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, কেউবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউবা কর্ম্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিষ তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার

করবার জন্যে এসেছিলেন যে স্বার্থত্যাগ করে, সর্ব্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেল্‌লে তবেই মুক্তি হয়, কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুন্‌তে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজ-পুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে—মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়ম পালনই ধর্ম্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডীর বাইরে অন্য জাতি, অন্য ধর্ম্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্ম্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তখন যিশু এই

অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসে-ছিলেন, যে, ধর্ম্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের অনুগত নয়—সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্ম্মসাধনা হয়, বাহিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ, কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্যে যিশুকে মরু প্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি অন্তরের

দিকে অখণ্ডের দিকে অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি—এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসঙ্কুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চল্‌তে হয়েছে—চারিদিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্ব্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্ম্মরাজ্যে যে তিন জন মহাপুরুষ সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্ম্মকে দেশগত, জাতিগত, লোকাচারগত সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্য্যের আলোকের মত, মেঘের বারিবর্ষণের মত সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্ম্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে

যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্ত্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখ্‌তে পারে না এই কথাটি তাঁরা সর্ব্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে প্রদীপটি কারো বা ছোট হতে পারে কারো বা বড় হতে পারে—সেই প্রদীপের আলো কারো বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে কারো বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন

তাঁর চারদিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না ; সেই জন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মত ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মত পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব—আর কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্য দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারদিকে এত বাধা-গ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে

এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

এ কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না। দেশ আপনার চিরদিনের যে জিনিষটি মনের ভুলে হারিয়ে বসেছিল—তার জন্যে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কি করে! চারদিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবশ্যক যার সহজ-চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়—সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা—যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়—সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্যে একলা তাঁকে কান্না জাগিয়ে তুলতে হয়—বোধহীনতার জন্যেই চারিদিকের জনসমাজ যে সকল কৃত্রিম জিনিষ নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে অসহ্য

ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে দেশ কাঁদতে ভুলে গেছে, খোঁজবার কথা যার মনেও নেই তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা খোঁজা এই হচ্ছে মহত্ত্বের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্যে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে—সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্বোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয়নি—সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল—স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল—চারদিকে যে সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল—চৈতন্য না হলে চৈতন্য আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সাম্‌নে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখীকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে' সে যেমন জান্‌তে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে—এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল,—যৎকিঞ্চজগত্যাং-জগৎ, জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।

তারপর থেকে তিনি নদীপর্ব্বত সমুদ্র প্রান্তরে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি

—কেননা তিনি যে সর্ব্বত্রই, আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্ব্বত্রই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত সুখ—যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস গীতগন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ!

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্চে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্চে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ

সৌন্দর্য্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেননি। এই প্রকাশের কাজে একদিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায় উৎসর্গ-করা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-একদিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী—এই দুই এখানে মিলিত হয়েছে—ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রী মন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য্য মিলিত হয়ে গেছে সেইখানেই পুণ্যতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করচি, হে শান্তি নিকেতনের অধিদেবতা, আজ উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্ব্বদা জাগিয়ে রেখে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠ্‌তে পারি! গ্রন্থের

মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তি সকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে সুযোগ যে অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলি যেন তাকে নষ্ট করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিত্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলে, যে মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া

যে একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তাহলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তাহলে আমরা দিয়েও যাব—তাহলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্ম্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্ম্মরিত হতে থাকবে; এখানকার আকাশের নির্ম্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব—এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে—এখানে যে সৃষ্টিকার্য্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চল্‌চে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মত ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্ব্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাটি

চিরদিন ফিরে ফিরে আস্বে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে, হে আনন্দময়, তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি, হে সুন্দর, তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, হে পবিত্র, তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে; হে অন্তরের ধন তোমাকে বাহিরে পেয়েছি, হে বাহিরের ঈশ্বর তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি।

হে ভক্তের হৃদয়ানন্দ, আমরা যে তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারিনে তার একটি মাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মত হতে পারিনি। তুমি আত্মদা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজস্র দান করচ—আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্ষুকতা কিছুতেই ঘোচেনা—আমাদের কর্ম্ম, আমাদের ত্যাগ, স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য থেকে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌চে না—সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্চে না—

আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দস্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারচিনে—আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠ্‌চে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতু স্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন—আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখ্‌তে পাই—তোমারই স্বরূপকে মানুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি ;—দেখি যে তাঁরা কিছু চান না কেবল আপনাকে দান করেন, সে দান মঙ্গলের উৎস থেকে আপনিই উৎসারিত হয়, আনন্দের নির্ঝর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে—তাঁদের জীবন চারিদিকে মঙ্গল লোক সৃষ্টি করতে থাকে, সেই সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি—এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই, কেবলি প্রাচুর্য্য, কেবলি পূর্ণতা—দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত

করে তখনো তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনো তাঁরা বর্ষণ করেন—তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন, হে পরম মঙ্গল পরমানন্দ, তোমাকে আমরা কাছে পাই—তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়েব ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ, ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি।—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিসুধা-সরস তোমার অতি মধুর লাবণ্য যেন

আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত রং নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে তা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে—অহঙ্কারের অন্ধতা থেকে যেন এই দেবদুর্লভদৃশ্য হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণ্যসঙ্গমের তীরে নিভৃত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি—মিলন-সঙ্গীত এখনো সেখানকার সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে, সেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বেজে উঠ্‌চে—থাক্‌তে থাক্‌তে শুন্‌তে শুন্‌তে সেই সঙ্গীতে আমরাও যেন কিছু সুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর—কেননা জগতে যত সুর বাজে তার মধ্যে এই সুরই সব চেয়ে গভীর, সব চেয়ে মিষ্ট,—মিলনের আনন্দে মানুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায়

এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্চ্ছনা।

৭ই পৌষ, রাত্রি, ১৩১৬।

চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়—প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে—এমন সময় প্রত্যূষে প্রভাত এসে পূর্ব্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে যাদুকরের মত জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়—দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজন-কর্ত্তা এই মুহূর্ত্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চির-কালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্চে না প্রভাত এই কথাই বলচে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে, কোথাও মরুপ্রান্তরে, কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড় বড় সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে,—এ সেই অতি পুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্ত্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল,—সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে

একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্য-মুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সাম্‌নে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মত এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্ত্তি—সদ্যোজাত শিশুর মতই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনি নবীন হয়ে ওঠে—এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কি? এর মানে হচ্চে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী—পুরাতনতা, জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মত আস্‌চে যাচ্চে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্চে—এ'কে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারচে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা, তারা মরীচিকার মত—জ্যোতির্ম্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে

তারা দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা—কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়। .

এই যে পৃথিবীর অতি পুরাতন দিন, এ'কে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আস্‌তে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুল্‌তে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্ম্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তারপরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার

নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধূলার পর ধূলা আবর্জ্জনার পর আবর্জ্জনা কেবলি জমে উঠ্‌ত—চেষ্টার ক্ষোভে, অহঙ্কারের তাপে, কর্ম্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলি মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলি কাড়তে যাওয়া, কেবলি ধাক্কা খাওয়া, কেবলি অন্তহীন পথ, কেবলি লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জম্‌তে জম্‌তে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্বুদের মত বিদীর্ণ করে ফেল্‌ত।

এখনো দিনের বিচিত্র সঙ্গীত তার সমস্ত মূর্চ্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠেনি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্ম্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠ্‌তে চাইবে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জ্জন উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মত এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরে-সুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেম্‌নি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই,—সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর—নিত্যরাগিণীর মূর্ত্তিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এম্‌নি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুন্‌তে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হোক্‌না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিষটি হচ্চে শান্তম্‌। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেই জন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্ত্তিতে একটু

আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্ত্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইচে কিন্তু রোজ সকাল বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্চেন শিবম্। প্রভাতে তাঁর একটি নির্ম্মল মূর্ত্তিকে দেখ্‌তে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলি রেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে বুদ্বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলট্‌ পালট্‌ হয়ে যাক্ না তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে—কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্, অন্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম্।

সমুদ্রে ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউয়ের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না—তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড,

তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারে অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়—তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসেনা। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্ত্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুন্‌তে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়—চরম হচ্চেন অদ্বৈতম্। আমরা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্ন বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলেনি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্, অন্তে অদ্বৈতম্, অন্তরে অদ্বৈতম্।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুন্‌তে

পেয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্ম্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্ম্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্চে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তিনি সৃষ্টি করচেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলি একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্চে এ কথা ঠিক নয়;—জগৎকে কেউ বহন করচে না, জগৎকে কেবলি সৃষ্টি করা হচ্চে—যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্চে—সেই প্রথমের

সংস্রব কোনো মতেই ঘুচ্‌চে না—এই জন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ — বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্ব্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—আমাদের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হতে হবে—আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছয়—প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে, আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না—আমাদের চিত্ত বারম্বার সেই মূলে ফিরে আসবে—সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে

সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনো মতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনি প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ বিভাগ ভেদ বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে

তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পার্ব্বে এত বড় শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে! কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি—সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্ব্বলতা। এই জন্যেই অহঙ্কারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগ সাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা আসে কোথা থেকে এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন? না গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্য্যন্ত যাক্

না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা—কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে—কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্ত্তেই তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিষ কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই;—তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই

নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এই জন্যে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারম্বার পরিস্ফুট করে তুলতে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মত আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্চে সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যত-দূরই যাক্ না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউয়ের মতই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু

তাকে ফিরতেই হবে—কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা পতনের দ্বারা ঘটবে—তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে :—

অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না সমস্তের মূলে যিনি আছেন, তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই জন্তে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভাল করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য্য—খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁৎ করে, সমস্ত তার গুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া এই ছিল জীবনেব গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্ত-মত সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামত তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখতে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের

রাগিণীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিনতে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুলতে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহুদিন সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটি প্রভাতের মত সরল, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন,—ভোগবিলাস ঐশ্বর্য্য উপকরণ খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান

থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্চে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমে কত কাজকর্ম্ম, অর্জ্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়—এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চল্‌বে না—আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ স্থরটিতে পৌঁছন, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা

আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বলচেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দ-সমুদ্রে কেবলি তরঙ্গলীলা চলচে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্ম্মের বেগে সে যতদূর পর্যান্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটাই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ সমুদ্রেই তাব লীলা চলচে—তার পরে কর্ম্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দ সমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই

হচ্চে যথার্থ জীবন—এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল—সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও! প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সকলের চেয়ে বড় হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য্য হয়ে উঠ্‌ব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি তবু বলছি এ পথ তোমার না হোক্! তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক্ যেখানে জগতের ছোট বড় সকলেই এসে মিলেছে; তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জ্জন করে তাকে সার্থক কর—যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করতে থাক্‌বে, যতই বাড়বে ততই

ত্যাগ করবে এই তোমার সাধনা হোক্! ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস—দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আস্‌বে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না, এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্তে মুহূর্তে এই রকম ঘট্‌চে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আন আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে, আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না—তারি মাঝে মাঝে

ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেলতে খেলতে মার কাছে বারবার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম্ম সংসারের খেলা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌বে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়;—সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখ যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার, দুর্য্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে;—দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আস—তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে, অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো

না, মনে কোরো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে—আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে—একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হ'য়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে—বাঁধা পোড়ো না এর মধ্যে—ফিরে এস তাঁর কাছে, বারবার ফিরে এস—জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতত্ত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখ—তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ

খুলে যাবে—সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে। জগতের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্চে—এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও—বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্ম্মকে নির্ম্মলরূপে সত্য করে তোলো!

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধূলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জান্‌তে,

দান বলে গ্রহণ করতে; এখন তুমি বল্‌তে শিখেছ, এটা পুরাণো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌চে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেন না, এযে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মত ভাস্‌চে; নীলাকাশের নির্ম্মল ললাটে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্‌ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করচে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা আপনি ভরে উঠ্‌ছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুম্‌কিও খসে নি; আজও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌চে, বল দেখি আমি তোমার জন্যে কি এনেছি! তবে জগতে জরা কোথায়? জরা

কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মত নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলচে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলি ফুটে ফুটে উঠ্‌চে। মৃত্যু কেবলি আপনাকেই আপনি ধ্বংস করচে—সে যা-কিছুকে সরাচ্চে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেল্‌চে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনি তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ কর, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মত মিলিয়ে যাক্; চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখ—শৈশবের সত্য দৃষ্টি ফিরে আসুক,

উঠুক, মৃত্যুর

স নিজেকে

চিরযৌবন দেবতার মত করে একবার দেখ,

সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ কর। সংস্কারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখ—কত বড় একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কি নিবিড়, কি নিগূঢ়, কি আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সঙ্গীতে বেজে উঠ্‌চে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে! এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন! এই সৌন্দর্য্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই—চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন—চির-সুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা—সংসারের সমস্ত পর্দ্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহঙ্কারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে

পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর—সত্য হোক্ তোমার জীবন, তোমার জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় হোক্, অমৃতময় হোক্!

দেখ, আজ দেখ, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই—কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলি কেটে কেটে যাচ্চে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মত আবৃত আবদ্ধ করতে পারচে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্ত মহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেদিগন্তে দীপ জ্বলচে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে—আজ তোমার কিসের সঙ্কোচ- আজ তুমি নিজেকে জান—সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠ, পুলকিত হয়ে ওঠ—তোমারি আত্মার এই মহোৎসব

সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মত এক ধারে পড়ে থেকো না —যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মত উঞ্ছবৃত্তি কোরো না!

হে অন্তরতর, আমাকে বড় করে জানবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘুচিয়ে দাও—তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও! আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য; আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্ম্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও! আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধূলায় নত করে দাও যে ধূলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব

বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্ব্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনই যেতে দেবেনা—ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আস্‌তেই হবে, বারম্বার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে! দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধূলা জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়—অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হাল্কা হয়, ধূলার চিহ্ন থাকে না,—একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতে গিয়ে পৌঁছতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও—তখন কোনো ব্যবধান রাখনা,—তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের

পথে আবার পাঠিয়ে দাও—নির্ম্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি,—মনে গর্ব্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্চি; কিন্তু প্রেমের টান ত ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব্ব নিয়ে ত আত্মার ক্ষুধা মেটে না—শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্ব্বলতা—তখন গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই—তখনি তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না—সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক্, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্ম্মের ঝঙ্কারে,—বাজতে বাজতে একেবারে নীরব

হয়ে যাক্, শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক্—পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক্—সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, জীবন মৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক্, অন্তর বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক্, ভূর্ভুবস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ, বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করচে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্য্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভাল বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়; তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্চে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কি, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মানুষ বল্‌তে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য

করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করচে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তাহলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন্ মানুষ-দের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত; সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন্, ভোগী নন্, প্রতাপশালী নন্ তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্চে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে

তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে.করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জ্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে কিন্তু এই জন্যেই যে মানুষ বড় তা নয়—মানুষের মহত্ত্ব হচ্চে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে; মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই—মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বল্‌তে পেরেছেন যে, ছোট হোক্‌ বড় হোক্‌, উচ্চ হোক নীচ হোক্‌, শত্রু হোক্‌ মিত্র হোক্‌ সকলেই আমার আপন।

মানুষের যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্ব্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগ স্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে

বড় হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খৃষ্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্চে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি, তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষ ভাবে আগলাতে সাম্‌লাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে

ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব্ব হয়—সেই গর্ব্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলি বাড়িয়ে নিয়ে চল্‌তে চেষ্টা হয়,—এর আর সীমা নেই—আরো বড়, আরো বড়, আরো বেশি, আরো বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চল্‌তে থাকে, তার সর্ব্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন স্থচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলি স্থুল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গল্‌তে পারে না, সে আপনার বড়ত্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্ত স্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড় সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড় কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্ব-জ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষ ভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন—ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্ত স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারত-বর্ষে আছে কিনা সে কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারত-বর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ —জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই

ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে এই ত আমাদের প্রতি উপদেশ।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নিও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই—ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মত পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করচে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়—নমোনমঃ

—তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার—সর্ব্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন যা কিছু উর্দ্ধে আছে অধোতে আছে দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে; যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চল্‌চ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্য্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্য্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্চে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কি?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্ব্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অনুভব করচেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্চে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে' সমস্ত জগৎকে সর্ব্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য্য পৃথিবীকে টান্‌চে, তাঁরই অনুভূতির

মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্ব্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্ব্বানুভূ—যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্ব্বানুভূ।

তাহলেই দেখা যাচ্চে যদি সেই সর্ব্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্চে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘট্‌চে। তার কাব্যদর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুল্‌চে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড় হয়ে উঠ্‌চে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ

যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্য্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্য্যন্তই সে সত্য, সেই পর্য্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ, সর্ব্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চ্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্ব্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড় পাওয়ার মূল্য কি? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই—আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সঙ্কেত আছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ কর, ভোগ কর—মা গৃধঃ, লোভ কোরোনা।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনা বর্জ্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বল্‌চে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এই সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উল্টো।

যে লোক আপনাকেই বড় করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয় ত নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম বলে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহঙ্কার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে—তখনই সে বড় হতে সুরু করে। কিন্তু সেই বড় হবার মূল্যটি কি? নিজের

প্রবৃত্তিকে বাসনাকে, অহঙ্কারকে খর্ব্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না;—গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে স্বাদেশিক হবার জন্যে মানুষকে শিশুকাল থেকে কি সাধনাই না করতে হয়। তার যে সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড় করে' পরকে আঘাত করে তাকে কেবলি খর্ব্ব কর্ত্তে হয়—তার যে সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চ্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ একদিকে যতই বড় হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়—ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ

ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়—একেই ত বলে বীতরাগ হওয়া। এই জন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, বলে, মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড় করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্চে মনুষ্যত্বের চেষ্টা।—আমরা আজ দেখ্‌তে পাচ্চি পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌঁচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্চে, বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতা-বোধকে য়ুরোপ যেমন

পরম মঙ্গল বলে মনে করচে এবং সে জন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্চে সাত্ত্বিকতার অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্ম্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্ম্মের চর্চ্চা করা—অন্নজল নদী পর্ব্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা; ধর্ম্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা মনের মধ্যে

বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড় তার চৈতন্যও তত বড় হওয়া চাই, এই জন্যই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্ব্বত্রই এমনতর সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মত স্পষ্ট বলেই'ত জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই এই অনন্তকে সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করেনি।

এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই

কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারি সাধনা প্রচার করবার জন্যে এদেশে মহাপুরুষেরা জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি -এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাঁকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোট করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড় রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে;—জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোট বড় আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে—এখানে মানুষের সঙ্গে

মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে. বিহারে সর্ব্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতেব অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্চি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ কবেননি।—তাঁকে হারানো মানেই হচ্চে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই,যা ভালো তা কেবলি বাধা পায়, পদেপদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্ব্বত্র ছড়াতে পায়না—সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না—দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলি পদ্মপত্রে

শিশির বিন্দুর মত টলমল করতে থাকে; তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে; তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করচে—যে বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করচে—দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলচে এবং মানব-ঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্ম্মাণ করচে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোট হয়ে গেল, ভরসা রইল

না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলি তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলি টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেওয়া, কেবলি ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই। যে মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুল্‌বে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, নচেৎ ইহ অবেদীৎ

মহতী বিনষ্টিঃ—ইহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জান্‌তে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য —প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্ব্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই, যে পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এই জন্য সকল দেশেই সর্ব্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করচে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজ্‌চে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্চে, কেননা সেই একই অমৃত—সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট

হয়ে মূর্ত্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করচে কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে —একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা প্রশস্ত করে নিয়েছে, সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে এখনো তারা ব্যাপ্ত হচ্চে, তাদের শক্তি এখনো কোথাও তেমন করে অভিহত হয়নি—তারা চলেছে তারা বদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই জন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কি? তারা মনে করচে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম—এর পরে বুঝি আর কিছু নেই—যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে

মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট্‌ দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করচে— আজকালকার দিনে উন্নতি বল্‌তে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে—এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্‌সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্ব্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী এই জন্যে তিনিই হচ্চেন সর্ব্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা,

বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্ব্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড় সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক্ থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে—আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলি আঘাত পেতে থাক্‌ব,—কেবলি অপমান কেবলি ব্যর্থতা ঘট্‌তে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা

করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌বে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠ্‌বে যিনি "সর্ব্বগতঃ শিবঃ," যিনি "সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ" যিনি "সর্ব্বানুভূঃ।" তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখ্‌লে আমাদের উন্নতি হবেনা তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল—যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠ্‌বে না, তাহলে আমি বল্‌ব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতা-স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্—সমস্ত উদ্ধত

সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বল্‌তে হবে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। প্রবলরা দুর্ব্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বল্‌তে হবে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ যিনি এক, অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই,—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু,—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্ব্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারত-

বর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্ম্মল চেতনার মধ্যে যে কি আশ্চর্য্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়—মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্চে—মনে হয় যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুল্‌বে। কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতার মূর্ত্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে,

লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখ্‌তে পাননি—মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি—এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, যস্যছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ—এইজন্যে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যুঃপ্রাণ স্তক্মা—প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্তু আয়তে, নমো অস্তু পরায়তে—যে প্রাণ আস্‌চ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্চ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তাও প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আস্‌বে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না।

সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রই তুমি—যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্চে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্চে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি সেই জন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন—প্রাণো বিরাট্—সেই প্রাণকেই তাঁরা সূর্য্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে—যে প্রাণ ক্রন্দন করচ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জ্জন করচ সেই তোমাকে নমস্কার—নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিদ্যুতে জলে উঠ্‌চ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়চ সেই তোমাকে নমস্কার—প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতর অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে

তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন— তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে—সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে হে সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দ তোমাকে সর্ব্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক্—যাক্ সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক্—দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক্—সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক্, শত্রুমিত্র মিলে যাক্,

স্বদেশ বিদেশ এক হোক্! হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিদ্র নই—তোমার অমৃত-ময় অনুভূতির দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক্ তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্য্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দুর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা ত কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেননি। কোন্ প্রেমের সুগন্ধ বসন্ত বাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্ত্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি—বলেছেন রসো বৈ সঃ—সেই জন্যই জগৎজুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম,—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানিভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্চি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নেজলে, ফুলেফলে, দেহেমনে, অন্তরেবাহিরে, বিচিত্র করে ভোগ করচি। হে অনির্ব্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখ্‌লে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নীচে নত হয়ে পড়ে, বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধূলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও—দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও, চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারো চেয়ে কিছুমাত্র বড় হতে;—তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়—রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্য্যে আপনাকে আর ধরে রাখ্‌তে পারচে না, চারদিকে ছড়াছড়ি যাচ্চে—

তোমার যে রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্চে না ফুরিয়ে যাচ্চে না—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায়মাতায়, স্বামীস্ত্রীতে, পুত্রেকন্যায়, বন্ধুবান্ধবে নানাদিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্চে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে অমৃত তারি একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও— তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি - যারা তোমারই সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরীব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুসি হয়ে যে জায়গাটিতে কারো লোভ নেই সেই খানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন

আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা—আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তাহলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বল্‌তে না পারব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

শান্তিনিকেতন

(একাদশ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য চার আনা

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

শান্তিনিকেতন

রসের ধর্ম্ম

আমাদের ধর্ম্মসাধনার দুটো দিক আছে একটা শক্তির দিক্, একটা রসের দিক্। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত এও ঠিক তেমনি।

শক্তির দিক্ হচ্চে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে। আমি যার কথা বল্‌চি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিষটি পৃথিবীর মত দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায় তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে—কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে, যে-সব জিনিষ সংসারের জোয়ারে-ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায় তাদেরই তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা কিছু হারায়, যা কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায় তার ক্ষতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি তার মনে হয় সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলি তার মনে

নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায় না। যে লোক ডুব জলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার পরমধন—তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে ব্যক্তির পায়ের নীচে সুদৃঢ় মাটি আছে তারও হাঁড়ি কলসির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়ি-কলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়—এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তাহলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক্ না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্ম্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখ্‌তে পেলেও সে মনে মনে জানে ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি—বিরুদ্ধ ফল

পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড় জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্চে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্ম্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্চে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুন্‌তে সহজ, এবং শোনবামাত্রই অনেকে হয় ত বলে উঠ্‌বেন যে, ঈশ্বর সত্য এ কথা ত আমরা অস্বীকার করিনে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারিনে। আমাদের মন সেই পর্য্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক না কেন, যিনি চরম সত্য পরম সত্য তিনি আছেন, এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমন ভাবে জীবনের কাজ করে আমরা কি তেমন ভাবে করে থাকি?—আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন—সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন—জীবনে যত উলটপালটই হোক্ এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্চে বিশ্বাসী—তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়াছেন এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত তাহলে ত এ একটি প্রস্তরময় ভয়ঙ্কর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে— সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্য-গতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতু পাথরের অচল ভিত্তির সর্ব্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্য্যের প্রবাহ

—তার চলা-ফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিষটি সচল ;—সে কঠিন নয় বলে, নম্র বলে, সর্ব্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে ; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলচে—এইজন্যেই কেবলি সে আপনার অপূর্ব্বতা প্রকাশ করচে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্ম্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখ্‌লে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেক সময় ধর্ম্মসাধনায় দেখা যায়

কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে; সে অন্যকে আঘাত করে; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না বলে কেবল সে একটা দিক্ দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্যদিকে আছে তারা কিছুই দেখ্‌চে না এবং সমস্তই ভুল দেখচে বলে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে জোর করে টেনে আন্‌তে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্য্যকে দুর্ব্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলে অবজ্ঞা করে, এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্ম্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ, ধারণ করা; প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্ম্ম-স্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্চে তার অস্থি-কঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময়, প্রাণময়, ভাবময়, গতিভঙ্গী-ময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্য্যকে।

ধর্ম্মসাধনারও চরম পরিচয়, যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিষটি রসের জিনিষ। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায় অনম্রতায়

তার সৌন্দর্য্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তাব বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্ম্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্য্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিষটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায় এ সে জিনিষ নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে নম্রতা—যে নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সঙ্গীতে মুখরিত হয়, এবং সূর্য্যের কিরণ ঝঙ্কৃত সেতারের সুর-গুলির মত উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; চারিদিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে—যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ

স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সঙ্গীতে পরিণত করে এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্য্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বল্‌তে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা—শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্য্যের দ্বারাই নত; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে—আনন্দের ধর্ম্মই হচ্চে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না—অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়—এমন কি, যে রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে।

রসের ঐশ্বর্য্যে যে লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্য্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত? যেখানে তিনি সুন্দর; যেখানে রসোবৈ সঃ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারেন না, সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়; সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দ-ভারে দুর্ব্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্চে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড় কথা;—তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য্য অনন্ত এ সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোট; তিনি নত হয়ে

সুন্দর হয়ে ভাবে ভঙ্গীতে হাসিতে গানে রসে গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন এইটেই হচ্চে আমাদের পক্ষে চরম কথা তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্চে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই যে দুইটি পরিচয়—একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনম্র সৌন্দর্য্যে—এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্য্যটি আছে তাকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য্য, মিল্‌বে বলেই, ধরা দেবে বলেই সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যেই রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড় হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না,

মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই জন্যে কৃচ্ছ্র-সাধনকে যখন কোন ধর্ম্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয় তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে' আবদ্ধ করে' রাখে; সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে—এই জন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহঙ্কার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখ্‌তে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এই জন্যে আপনার ধর্ম্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে; ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও ধর্ম্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের স.ঙ্গই পৃথক্ করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্ম্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারই প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্য্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলি দূর করচে, কেবলি ভাগ করচে, নিজেকে কেবলি সঙ্কীর্ণ বদ্ধ করে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করচে। হিন্দুর ধর্ম্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের

লোকের পক্ষে সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বলতে পারিনে। কারণ, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক। অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার উপরের জিনিষ। ক্রীতদাস রাজাকে খুন করে সিংহাসনে চড়ে বসলে যেমন হয় স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্ম্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল করে বসে তাহলে সেই রকমের অন্যায় ঘটে। এই জন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক

বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে রাখতে থাকলেও ধর্ম্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে সেই খানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্র পথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে ধর্ম্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক্ করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আচরিত অন্নজল গ্রহণে মানুষ ধর্ম্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি—তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে?

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারই হাতে দিতে চেষ্টা করচি যে জিনিষটা ধর্ম্মের চেয়ে নীচেকার। আমরা

স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বল্‌চি, তা নাহলে আমরা বড় হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্ম্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজনবুদ্ধিও তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে যে, ধর্ম্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে, ধর্ম্ম আমাদের পৃথক থাকতে বল্‌চে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করচে!

কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি যে মিলনের ঘটক নয় সে মিলনের উপর আমি ভরসা রাখ্‌তে পারিনে। ধর্ম্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলি গণ্ডি

আঁকবার এবং বেড়া তোল্‌বার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্ম্মের সিংহদ্বার খোলা থাক্‌লে তবেই ছোট বড় সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব;—নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা স্বাজাত্যঅভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি তবে ধর্ম্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদ পার্থক্য এত বিরোধ-বিচ্ছেদ গল্‌তে পারবে না, মিল্‌তে পারবে না।

ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে ধর্ম্ম যখন আপনার রসের মূর্ত্তি প্রকাশ করে তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা য়িহুদিধর্ম্মের কঠিন শাস্ত্র-বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখ্‌তে পারলে না এবং সেই ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের

শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করচে, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করচে।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করেনি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে' কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ

করে। ধর্ম্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে, এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলেনি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলেনি, আচারের শুষ্কশাসনে মেলেনি।

ধর্ম্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্চে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চ্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্ম্মিকতার অহঙ্কার

জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাক্‌লে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখ্‌তে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক্ কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুল্‌লে দুর্ব্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক্ আছে সেটি না থাক্‌লে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্চে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেন না দুঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়, সেবার মধ্যে কর্ম্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক

হয়েছে সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্ব্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখ স্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারের কর্ম্ম মলিন করে না, তাকে আরো দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে কর্ত্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয় সে তাঁর অলঙ্কার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এই জন্যে মানবসমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্ম্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন, এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার

অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না— তাঁরা অনায়াসেই কর্ম্মকে শিরোধার্য্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়—দুঃখে নম্রতা ও কর্ম্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। কর্ম্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন কর্ম্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থ ভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্ব্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয় তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে

দেশদেশান্তরকে উর্ব্বর করে সে চল্‌তে থাকে; তখন নুড়ি পাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সঙ্গীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাৎ কোন্ খানে? না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায় তার ক্ষয় হতে থাকে—এই জন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজেরই গতি, সেই জন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য্য। এই জন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান

করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনই মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনি তার ওঠা বসা খাওয়া পরা সকল দিকেই বাঁধাবাধি। তখনি সে সেই সকল নিরর্থক কর্ম্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়।

সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম্ম করে, সর্ব্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যা হচ্চে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই

হচ্চে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এইজন্যে মানুষের ধর্ম্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয় তখনি সংসারে যেখানে যা কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়—তখন কর্ম্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্ম্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

গুহাহিত।

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন—"গুহাহিতং-গহ্বরেষ্ঠং"—অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা কিছু প্রকাশিত তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ় যা গভীর তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা' যদি না থাকতো তা হলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ করে কেবল বাইরের জিনিষে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে

চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্চে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্চে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে-বের-করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল? যা কিছু পাচ্চি তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্চিনে—যা পাচ্চিনে তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল?

পশুদের মনে ত এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারই মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্চে—মুহূর্ত্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে, যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারচে না বলে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার, মানুষ প্রত্যক্ষের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না—এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে দেখতে পাচ্চিনে কিন্তু আরও আছে, শোনা যাচ্চে না কিন্তু আরও আছে।

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেল্লেই তা' প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে এ কিন্তু সে রকম নয়—এ আচ্ছন্ন বলে গুপ্ত নয় এ গভীর বলেই গুপ্ত—সুতরাং একে যখন আমরা জান্‌তে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

গোরু উপরের থেকে ঘাস্ ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটি চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নীচেকার মুথার প্রকৃতিগত কোন প্রভেদ নেই, দুটিই স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই

সমান রকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষ গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে, সাদৃশ্য নেই। তা' খনির ভিতরকার খনিজের মত তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিষ নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চেয়ে বেশি মূল্যবান্ রত্ন বলেই জানে।

তার মানে আর কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে, তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এই জন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকু মাত্র দেখেই মাটীর দিকে চোখ ফেরায়নি—এই জন্যে কোন্ সুদূর অতীত কালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরু-প্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে

নিশীথরাত্রের আকাশ-পৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্ক-রহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ নিদ্রাহীন নেত্রে যাপন করেছে ;— তাদের যে মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারো সেদিকে তাকাবার প্রয়োজন মাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায় নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ যে কেবল সত্যকেই উদ্ঘাটন করেছে তা বলতে পারিনে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এক-কে আর বলে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই কিন্তু তাইবলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে ত একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি

অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে যে সত্য বলে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূত প্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্ত্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই কিন্তু তাই-নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখিনে। গভীরজলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগ্‌লি ওঠে তার থেকেই জাল ফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেল্‌চে তার থেকে এ পর্য্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারিনে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা এইটেই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ;··· আফ্রিকার বন্যবর্ব্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয়

পাই তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্ত্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য—এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, একে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মান্‌তে চায় না। এখানে সমুদ্র পর্ব্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না, বারম্বার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না—এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারে।

মানুষ যে দ্বিজ; তার জন্মক্ষেত্র দুই

জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করচে, সে জন্যে তাকে চতুর্দ্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয়। তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয় কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জ্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি—এমন কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড় করে তোলে তখন সবদিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে গোপনের দিকে গভীরতার দিকে মানুষের

চেষ্টাকে যখন টানে তখনই মানুষ বড় হয়ে ওঠে, ভূমার দিকে অগ্রসর হয়, তখনি মানুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা স্থূল যা প্রত্যক্ষ তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এই জন্য কেবলমাত্র সেইদিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত, তাঁর সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক, সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না—তাকে মাপ করে ওজন করে দেখাবার কোনো উপায়ই নেই—তাকে যদি কোনো

স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে, কি তুমি পেলে একবার দেখি—তাহলে বিষম সঙ্কটে পড়্‌তে হয়। এমন কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি ভারী জিনিস হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারিনে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে আমি সমুদ্র দেখ্‌ব, আমি হিমালয় পর্ব্বত দেখ্‌ব তবে তাকে এ কথা বলতে হয় না যে, আগে তোমার চোখ দুটোকে মস্ত বড় করে তোলো তবে তোমাকে পর্ব্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব—কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বল্‌তেই হয় একটু রোসো; গোড়া থেকে সুরু কর্‌তে হবে; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত কর তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ

মেল্‌লেই চল্‌বে না, কান খুল্‌লেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। মূঢ় যদি বলে, না, আমি সাধনা করতে রাজি নই, আমাকে তুমি এ সমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মত সহজ করে দাও, তবে তাকে, হয়, মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয়, তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে গুহা-হিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখা-শোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক সময় খুঁজে থাকি—কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজে করে দিচ্ছি; বলে সেই যিনি "নিহিতং গুহায়াং" তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন খুসি

এক রকম করে দাঁড় করিয়ে দেন তাহলে বল্‌তেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন। এ রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর বলেই তাঁকে চায়—সেই গভীর আনন্দ আর কিছুতে মেটাতে পারে না বলেই তাঁকে চায়—চোখে-দেখা-কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে—তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা ত দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্চে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত কিছু চায় না বলেই একাগ্র মনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা কর, এবং যখন তাঁকে পাবে—তোমার "গুহাশয়" রূপেই তাঁকে পাবে; অন্যরূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা

নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না—তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা, সর্ব্বত্রই তিনি গুহাহিতং, কি সাহিত্যে, কি ইতিহাসে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—এই কথাটি যে মানুষ বলতে পেরেছে এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এই জন্যেই সে গভীরকে চায়—তবু যদি তুমি বল আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও তবে তুমি আর কিছুকে চাচ্চ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা

অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝ্‌ছি তার মত কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতিপ্রত্যক্ষগোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজ দেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা কিছু পাওয়ার মত পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্ম্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ করে তবে কর্ত্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধাতৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মত সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এই জন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্চে—বারংবার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে

পারচে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্ম্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে; ভালবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করচে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য্য হোক্ এ'কে সে কোনো-মতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না; তাকে বলতেই হবে যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন—কেন না, তার পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।

জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে মানুষের পক্ষে সর্ব্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে

সর্ব্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম করে' গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা করে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে এ কথা বলে না, টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।—টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মত সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উল্‌টা কথা বল্‌তে যাব! কেন বল্‌ব তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই! কেন বল্‌ব আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ করে তাঁকে হাতে হাতে চোখে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব!

না, কখনো তা আমরা চাইনে! তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই,

জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠচে। হে গূঢ়! তুমি গূঢ়তম বলেই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্ম্মকে গভীর হতে গভীরতরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্চে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্চে, তার বন্ধন আল্‌গা করে দিচ্চে, তার জীবন মরণের তুচ্ছতা দূর করচে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম সুর

আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসচে ; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্ত তোমার ঐ অনির্ব্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্চে। মানব চিত্তের এই আকাঙ্ক্ষার আবেগ এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে চলেছ। হে গুহাহিত, তোমার গোপনতার শেষ নেই বলেই জগতের যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন ; এমন মধুর করে তাঁরা দুঃখকে অলঙ্কার করে পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে বরণ করেছেন্। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্কতলে লুটচ্ছে—তারা, বল তেজ সম্পদ সমস্ত

হারিয়েছে—তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলি ছোট ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্বল কল্পনা করে তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে তারা মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ গৌরবকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।*

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু;—প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।" তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো-করে না দেখি। তোমাদের ঐ পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে ততই তার কাব্য সঙ্গীত ললিতকলা অনির্ব্বচনীয় রসের আভাসে

রহস্যময় হয়ে উঠ্‌চে, ততই তার জ্ঞান, সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করেছে, তার কর্ম্ম, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করচে—তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠ্‌চে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চল্‌ব—আমার সমস্ত যাত্রাসঙ্গীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্য্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে,—পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে কোনো ছোটকে কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে—আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

২৩শে চৈত্র, ১৩১৬ সাল।

দুর্লভ

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

পারিনে যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারিনে; যেমন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করচি কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্চেনা, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনে।

কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয়; ইন্দ্রিয় বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্ম্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূর টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ হয়ে ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বল্‌বে "আমি পারিনে" সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে

যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চলতে শিখতে হয়নি। মানুষকে অনেকদিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে; আমি পারিনে বলে সে নিষ্কৃতি পায়নি। মাঝে মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই সব মানুষ জন্তুদের মত হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেই জন্য শিশুদের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়া হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনি সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনি পৃথিবীর উপরে সে কর্ত্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে।

কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবন-যাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে ; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানচে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুলতে পারল তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে কষ্ট করে শিখতে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহুকষ্টে শিখতে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, চলা বলা, এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে

হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়ম সংযম মান্‌লে তবে চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়—ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকার লাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখচি কানে শুন্‌চি তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এই জন্যেই বিদ্যালয় বলে কত বড় একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়—তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুড়ি পঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয়—এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখতে পাই মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করচে। আহারের জন্যে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্যে আকাশে দূরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল সর্ব্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্যে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে, পারিনে, তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারই মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে—সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্ব্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে অনাবশ্যক দুঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর

কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিষটা নেই। যেটা সহজ, যেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখ্‌লে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে সে কেবল প্রয়োজন সাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে পড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্য সাধনের জন্যে নয়। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এই জন্যেই যে ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুন্‌তে পাই বারম্বার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষার-মরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে তখন এই কার্য্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের

একটা কিছু কষ্টের হেতু আছে—এমন একটা কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে "পারিনে" একথাটা বলতে দেওয়া হয়নি তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে সত্য হবে, এ সম্বন্ধেও "পারিনে" বলা তার চলবে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায় তবেই একথা বলা তার সাজবে না যে আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়।

যতই সহজ ও যতই আরামের হোক্ তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মত চলে বেড়াব না মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ্ ছিল বলেই মানুষ যেমন বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে—এবং সেই আকাশে

মাথা তুলেছে বলে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়নি, বরঞ্চ পশুর চেয়ে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলি সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মত ধূলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না—অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে বলে হাতের ব্যবহার পায় না তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে

চার পায়ে চলে বলে কেবল চলে মাত্র, সে ভাল করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারেনা। কিন্তু যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে মাথা তুলে চল্‌তে শিখেচেন, তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়—তাঁদের দুই হাত মুক্ত হয়েছে—তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে—তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্ত্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা।

যে সৃষ্টিকর্ত্তা সে আপনাকে সর্জ্জন করে; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড় হয়ে উঠেছে। যে পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। এই সৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল

ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে পরিমাণে স্বার্থবর্জ্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম্ম, সৃষ্ট হয়ে উঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্ব্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে "পারিনে" বল্লে চল্‌বে না— চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার "মহতী বিনষ্টিঃ"।

যে ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই নিজেকে উৎসর্জ্জন করচে, যিনি "আত্মদা", আমি জলে স্থলে আকাশে সুখে দুঃখে সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্চে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্চে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চলতে শেখা। অনেকবার টলতে হবে, বারবার পড়তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না, তবে বুঝি পারব না। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অন্তরের মধ্যে এইদিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে—এই জন্যে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না তাকে বরণ করে নেয়—এই জন্যেই মানুষ এত বড় একটা আশ্চর্য্য কথা বলে জগতের অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

জন্মোৎসব*

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ—এতে আমার অনেক দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগেনি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড় করে আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

বস্তুত নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড় নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

---

* বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত।

জন্মোৎসব

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন উৎসব তাঁদেরই। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ-উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড় করে উপলব্ধি করে-ছিলেন তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে—সংসারে তার আবির্ভাব যে পরমরহস্যময় এবং সে যে চিরদিন এখানে থাকবে না সে কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে—মনে হয় তার ক্ষতিও নেই বৃদ্ধিও নেই, সে আছে ত আছেই—তার মধ্যে অন্তরের

প্রকাশ আর আমরা দেখ্‌তে পাইনে। তখন যদি আমরা উৎসব করি সে বাঁধা প্রথার উৎসব—সে একরকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না—তখন সে যেন আমাদের কাছে এক রকম ফুরিয়ে আসে। সে রকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চল্‌তে পারে কিন্তু উৎসব চল্‌তে পারে না—কারণ, উৎসব জিনিষটাই হচ্চে নবীনতার উপলব্ধি—তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্চে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেই খানেই তার প্রকাশ!

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেই দিনের কথা মনে পড়চে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জ্বলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে আজ তোমার জন্ম-দিন! আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ সেই রকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত—নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠ্‌ত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহদৃষ্টির পথ

বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠ্‌ত। বস্তুত জীবন তখন আমার সাম্‌নেই— পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধূয়াটির মত অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্ব্বচনীয়ের তান লাগাতে থাকৃত।

পথ তখন নির্দ্দিষ্ট হয় নি। নানাদিকে তার শাখাপ্রশাখা! কোন্‌দিক্ দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কি পাব তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দ্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ত।

ঝর্‌না যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চল্‌তে আরম্ভ করে তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাঁকে নানা দিকে নানা গতি পরিবর্ত্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দ্দিষ্ট হয় তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারও জীবনের ধারা যখন ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগ্‌ল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সঙ্কুচিত হয়ে চল্‌তে থাক্‌ল। তখন নিজের জীবনকে বারম্বার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এই জন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর কোনো নূতন আশার সুরে

বাজ্‌তে থাক্‌ল না। সেইজন্যে জন্মদিনের সঙ্গীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বন্ধ হয়ে এল তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর কারো কাছে এর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এমন সময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম ত আমার অর্দ্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে যে কবেকার পুরাণো কথা তার আর ঠিক নেই—মৃত্যু-দিনের মূর্ত্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে—এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার ?

এমন সময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল—এবং সেই কথাটাই তোমাদের সাম্‌নে আমি বল্‌তে ইচ্ছা করি।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে? জগতে আমরা অনেক জিনিষকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্প জিনিষকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাইনি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বল্‌ছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্চে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্ত্তেই আপনার লোককে পায়,—পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন

চিরন্তন। অল্পকাল পূর্ব্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না—না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার, কোনো প্রয়োজন হয়নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মত আপন করে পাওয়া যায় তখনো এই সাজসজ্জা এই গীতবাদ্য। "তুমি আমার আপন" এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না—এতে সৌন্দর্য্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল তোমাকে আমরা

পেয়েছি—সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করচ তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোন গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা বলতে পারিনে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয় —তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন্ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম, কে জানে! কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতনক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মত আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও এ কত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ

বেঁধে গেছে! সেই জন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্ব্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাত লোক ছিল।

সেই জন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকলে তোমাদের আনন্দ উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করচি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি এ আমার সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্চে কেন্দ্রবর্ত্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়—এখানে সে অনেকের অন্তর্ব্বর্ত্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্চি কেন্দ্র, অন্য সমস্ত তার পরিধি, মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালমন্দেই তার ভালমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারিনে; মায়ের কোলেই ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক্ থেকে এ যেমন, অন্তরের দিক্ থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেই রকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারিনে। জ্রণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠিনে। তখন আমরা চল্‌তে চাই, কারণ, চারিদিকে চলার ক্ষেত্র অবাধবিস্তৃত—কিন্তু চল্‌তে

পারিনে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্চে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মত চল্‌তে গিয়ে বারবার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে ঘুমিয়েই কাটাচ্চে তখনো যেমন জানা যায় সে এই চলা ফেরা জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে বয়স্কদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকে না তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হয়েছে সে কথা একরকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি জড়তার

সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতর বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে তখন অনেক দুঃখস্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ, এলোকের জীবনই হচ্চে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকে না, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে, তার অন্তরাত্মা যে ডালকে আশ্রয় করে তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে শ্রেয়কে আশ্রয় করে' সে অহঙ্কারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহঙ্কার গোপনে সেই

শ্রেয়কেই আশ্রয় করে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি করে প্রথম অবস্থায় বিরোধ অসামঞ্জস্যের বিষম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি এখানে আমার পূর্ব্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এই জন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু একথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মত আশ্রয় করেছিমাত্র বয়স্কের মত

এ'কে আমি অধিকার করতে পারিনি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসঙ্গতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ—একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ এবং সেই জন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ একথা যদি সত্য হয় তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এই সঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যেলোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এলোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জান্‌তে পারতে না। এই

আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝরণাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানা সুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে একটি বৃহৎ ধারায় সম্মিলিত হয়ে নদী-জন্মলাভ করে —তোমাদের ছোট ছোট জীবনের ধারাগুলি তেম্‌নি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে—তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জান্‌তে—সেই জানার সঙ্কীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে পাচ্চ—এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ এই হচ্চে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্ত সম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোন সঙ্কীর্ণ ব্যবধান নেই;

এখানে তিনিই পিতা হয়ে প্রভু হয়ে আছেন, "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ," যাঁর জাতি নেই, "বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি," যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজন সকল বিধান করচেন,—"বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ," বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি, "সদেবঃ" সেই দেবতা। "সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গল বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন্। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫শে বৈশাখ ১৩১৭

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে, জগতে আর যত কিছু কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমত তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারা-পতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দ্দার উপরে পর্দ্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার

তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুল্‌চে—শিশু তার নূতন-শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে, সেই রকম—তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনচে—আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছু একটা বল্‌তে চাচ্চে।—ঐ রকম খুব বড় করেই বল্‌তে চায়, ঐ রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বল্‌তে চায়—কিন্তু সে ত কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজ্‌চে। জলের কল্লোলে, বনের মর্ম্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা কিছু কথা

সে ত স্পষ্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এই জন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্ব্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিষটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর, গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেই জন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এই জন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিষ করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত-সন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রং মিলিয়ে দেয়, জগতের

বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করচে। প্রকৃতি হতে রং এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলচে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলচে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিষগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্কোচ এবং নিত্য-ব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস, নবীন এবং মহৎ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘন বর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্চে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করচে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলচি আমার কথা আজ থাক্। সংসারের কাজ কর্ম্মের সীমাকে, মনুষ্য-লোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশ-ভরা শ্রাবণের ধারা-বর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড় বিচিত্র। বাহিরে তার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর এক মূর্ত্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখ—গাছের ফুল। তাকে

দেখ্‌তে যতই সৌখীন হোক্‌ সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজ সজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হোক্‌ তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিঁকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এই জন্যেই তার রং, এই জন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমনি তার পুষ্পজন্ম সফলতা লাভের উপক্রম করে অমনি সে আপনার রঙীন্‌ পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দেয়; তার সৌখীনতার সময় মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে, হন্‌হন্‌ করে ছুটে চলেছে,—যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ৎ কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে

ছাপ পড়ে যায় "নামঞ্জুর," তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ঐ ফুলটিকে যে দেখচ, অত্যন্ত বাবুর মত গায়ে গন্ধ মেখে রঙীন পোষাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্ত্তের হিসাব দিতে হয়—বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্ত্তিমান। এই একই জিনিষ বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, তুমি ভুল বুঝচ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য

কাজ করা—তার সঙ্গে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের যে অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ সে তোমার নিজের পাতানো।

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, কিছুমাত্র ভুল বুঝিনি। ঐ ফুলটি কাজের পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্য্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে আঘাত করে—একদিকে আসে বন্দীর মত, আর একদিকে আসে মুক্তস্বরূপে—এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয় একথা কেমন করে মান্‌ব? ঐ ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্য্য-কারণ-সূত্রে ফুটে উঠেছে একথাটাও সত্য কিন্তু সে ত বাহিরের সত্য, আর অন্তরের সত্য হচ্চে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

ফুল মধুকরকে বলে তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আন্‌ব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি—

আবার মানুষের মনকে বলে আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি। মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে' কিছুমাত্র ঠকেনি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস করে' তাকে ধরা দেয় তখন দেখ্‌তে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলেনি।

ফুল যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করচে তা নয়—মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, তা সে বরাবর করে আসচে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কি? প্রকৃতির দরজায় যে ফুলকে যথাঋতুতে যথা-সময়ে মজুরের মত হাজ্‌রি দিতে হয় আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মত উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদ্‌ছিলেন তখন একদিন যে দূত কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে

করে এনেছিল—এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে—তখনই তিনি বুঝলেন রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্ব্বাসিত হয়ে আছি—রাক্ষস আমাদের কেবলি বল্‌চে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা কর।

কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে, আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে একমুহূর্ত্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি

তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।

যদি তখন আমরা জেগে থাকি ত তাকে বলি তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা জানব কি করে? সে বলে, এই দেখ আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রং এর কেমন শোভা!

তাইত বটে। এ যে তাঁরি আংটি, মিলনের আংটি। আর সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দময়ের আনন্দ স্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনি আমরা বুঝতে পারি এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয় —এর বাইরে আমার মুক্তি আছে—সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবল-মাত্র রং, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধা-

নিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন—মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য্য, তাই বিনাপ্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙীন কালীতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হোক্ না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানাঘরের কলশব্দ সঙ্গীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্য্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড় আশ্চর্য্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির—একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং

আনন্দের—বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি—একই সময়ে এক-দিকে তার কর্ম্ম আর একদিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই যে এই মুহূর্ত্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে এই অন্ধকার সভায় আমাদের কাছে এ কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্চে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে

উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলি করুণ গান জেগে উঠ্‌চে :—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি

হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্ত্তাই সে জানাচ্চে, ওরে, তুই যে বিরহিনী—তুই বেঁচে আছিস্‌ কি করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাট্‌চে ?

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্চে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্চি এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেন না বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া

যেমন আগুন জ্বলার আরম্ভ বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে? ঐ যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করচে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, যারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা থেকে দিন রাত্রি কেবল বোবার মত কাজ করে যাচ্চে— তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই এ যে বিরহের বেদনা-গান, এ যে মিলনের আহ্বান-সঙ্গীত। যে সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না সে সব খবরকে এরাই ত চুপি চুপি বলে যায়—এবং মানুষ কবি সেই সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে,—

"ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!"

আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই যে বর্ষা, এ ত এক সন্ধ্যার বর্ষা নয় এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্চে ; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বল্‌চে—"কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।" কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয় ;—এই অন্ধকারের এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে ; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আস্‌চে, এমন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য —যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুল্‌চে তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আস্‌চে।

বিরহ সন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, "কেমন করে তোর দিন-রাত্রি কাট্‌বে"—তাহলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্য্যন্ত বাঁচত না ; —কিন্তু শুধু কেমন করে কাট্‌বে নয় ত—"কেমন করে কাট্‌বে হরি বিনে দিনরাতিয়া"—সেই জন্যে "হরি বিনে" কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ ! চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে—তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে সে আছে—বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে—সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া ! এই জীবন-ব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ-সুরের বাঁশী বাজাচ্চেন সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া !

দ্বিধা

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম-নীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্চে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যতকিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্য শিল্প সমস্তই হচ্চে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই

হচ্ছে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাক-স্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই দুটোকে এক করবার জন্তে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্ব্বদাই জাগিয়ে রেখেছে; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে—ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্য-সাধনের জন্তে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হচ্চে তার আর সীমা নেই; উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই, অথবা যেখানে তার মিলনসাধনের জন্তে বাইরের উপায় কাজ করে সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক্ এবং পরমার্থের দিক্, বন্ধনের দিক্ এবং মুক্তির

দিক্, সীমার দিক্ এবং অনন্তের দিক্—এই দুইকে মিলিয়ে চল্‌তে হবে মানুষকে।

যতদিন ভাল করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান পতনের দুঃখ সে বড় বিষম দুঃখ। যে ধর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘট্‌তে পারে সেই ধর্ম্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা;—একথা তার বলবার জো নেই যে এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চল্‌ব। এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয়;—সেই দুর্গতি যে কি নিদারুণ পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই—তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীর ধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চল্‌বে এতে তাদের কোনো ধিক্কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসঙ্কোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সঙ্কোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ আড়ালের মধ্যে দিয়েই চল্‌তে হয়—তার আহার বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত—নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন কি, নিজের নিত্য-সহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ মানুষ যে পশু এবং মানুষ দুইই। একদিকে সে আপনার আর একদিকে সে বিশ্বের। একদিকে তার সুখ, আর একদিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক।

যদি জানতে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে তাহলেই বুঝতে পারি এ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই সকল আপাত-অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকারবাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি, বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না—উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয় তবে সেই সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়—যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টার

দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জ্জন করতে প্রবৃত্ত করে—তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই—তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে—মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্চে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্য-সাধন। কারণ স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাক্‌লেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই তখনই আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনই আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানেনা বলেই তার মাকে জানেনা—যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত

হয়ে সে নিজেকে জানে তখনি সে মাকে জানে।

সেই জন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলি টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই— মা মা হিংসীঃ—আমাকে আঘাত কোরোনা, আমাকে আর আঘাত কোরোনা। আমি এমন করে কেবলি দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচিনে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত—এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না—পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না,—মানুষ পশুদের মত অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই জন্যে মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না—'বিশ্বানি দেব সবিত দু'রিতানি পরাসুব'—হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও! এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজন সাধনের প্রার্থনা নয়—মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে আমাকে পাপ হতে মুক্ত কর। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না—পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারচিনে—হে অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারচে না

—তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারছিনে।

'যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব'—যা ভাল তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব—ভাল যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা দুঃখের প্রার্থনা—নাড়ি ছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারেনা।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু —যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা বলে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত

করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তাহলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়—আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায়;—সেখানে কোনো অহঙ্কার টিঁকতেই পারে না—ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়;—মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহঙ্কারের একান্ত বিসর্জ্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার?

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার—যিনি সুখের আকর

তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার যিনি চরম মঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা বলে নমস্কার করচে তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা গেছে পিতরৌ বলতে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন—তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর-সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এই জন্যে তাকে দেখা শোনা তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস

তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সঙ্কীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এই জন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি এক মাত্র হত নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত তাহলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়—তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোট হয়ে না থেকে বড় হয়ে ওঠবার যে দুঃখ তা তাকে না

দিলে চলে না। বড় হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে যে সত্য হবে, তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তিলাভ করবে—এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়—যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়—যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ; শরীর চালনা

করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখ্‌তে পাই বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র-ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে, যে, জগৎ চল্‌বে, জীবন চল্‌বে এবং সেই সঙ্গে আমি পদে পদে খুসি হতে থাকব। নক্ষত্রলোকের যে সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্ত্তী হোক্ না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেই জন্য অতবড় অচিন্তনীয় বিরাট্ কাণ্ডও প্রয়োজনবিহীন গৃহসজ্জার মত হয়ে উঠে' আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুম্‌কির কাজে খচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখ্‌তে পাচ্চি জগতের রাজা আমাকে খুসি করবার জন্য তাঁর বহুলক্ষ যোজনান্তরেরও অনুচর পরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুলতে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্য নয়।

কিন্তু সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই—তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে—বলে, যে, তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না। এই সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে মুক্ত হয়ে তোমাকে থাকতে হবে তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতন-ভাবে তার মাকে পায় তেমনি এই সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গল-লোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে তখনই সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনি

আসক্তির পথে যাবে তখনই সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে—বস্তুকে যখনি চোখের উপরে টেনে আনবে তখনি তাকে আর দেখ্‌তে পাবে না, তখনি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে—এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগ সাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গল বোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাকতে দিচ্চে না—এই মঙ্গল বোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্চে—মা মা হিংসীঃ, বিশ্বানি দেব সবিত র্দুরিতানি পরাসুব, যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়া পরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে—আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত কর; আমাকে

সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করচে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার, আর সেই কল্যাণ-কর যে তাঁকেও নমস্কার—একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখ্‌তে হবে তাই বলি, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ—সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার—মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করচেন পালন করচেন তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করচেন তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে

—তখন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ নেই বিরোধ নেই—তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর—তখন পিতা এবং মাতা একই—তখন একমাত্র পিতা ;—এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত উর্দ্ধগামী একাগ্র এই নমস্কার—অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মত দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

শান্তিনিকেতন

(দ্বাদশ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য চারি আনা

প্রকাশক
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২,কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

শান্তিনিকেতন

পূর্ণ

আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বল্লেন, আজ আমার জন্মদিন; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।

তাঁর সেই যৌবন কালের আরম্ভ, আর, আমার এই প্রৌঢ় বয়সের প্রান্ত—এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে! তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবার,

কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।

যে ছাত্র তার কলেজ-শিক্ষার প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে সে যখন শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাত হাতে কোনো ছেলেকে পাঠশালায় যেতে দেখে তখন তাকে মনে মনে কৃপাপাত্রই বলে জ্ঞান করে। কেননা কলেজের ছাত্র এ কথা নিশ্চয় জানে যে ঐ ছেলে শিক্ষার যে আরম্ভভাগে আছে সেখানে পূর্ণতার এতই অভাব, যে, সেই শিশুশিক্ষা ধারাপাতের মধ্যে সে রসের লেশমাত্র পায় না—অনেক দুঃখ ক্লেশ তাড়নার কাঁটাপথ ভেঙে তবে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যেখানে তার জ্ঞান নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে করতে আনন্দিত হতে থাকবে।

কিন্তু মানুষের জীবন বলে যে শিক্ষালয়টি

আছে তার আশ্চর্য্য রহস্য এই যে, এখানকার পাঠশালার ছোট ছেলেকেও এখানকার এম, এ, ক্লাসের প্রবীণ ছাত্র কৃপাপাত্র বলে মনে করতে পারে না।

তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারিনে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে তারাই সব চেয়ে বড় হয়ে আমার চোখে পড়চে না—এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য আছে সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্চে।

মানুষের কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের এইখানে একটি প্রভেদ আছে। মানুষের ভারা-বাঁধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য

প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ, সেও সুন্দর। সে যদি চারা অবস্থাতেই মারা যায় তবু তার কোথাও অসমাপ্তি ধরা পড়ে না। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয় তার সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা।

একদিন ত শিশু ছিলুম, সে দিনের কথা ত ভুলিনি। তখন জীবনের আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তখন শরীরের শক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনা যেমন অল্প ছিল, তেমনি জীবনের ক্ষেত্র এবং উপকরণও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। ঘরের মধ্যে যে অংশ অধিকার করেছিলুম তা ব্যাপক নয়, এবং ধূলার ঘর আর মাটির পুতুলই দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অথচ আমার সেই বাল্যের জীবন আমার সেই বালক আমির কাছে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। সে যে কোনো অংশেই অসমাপ্ত তা আমার মনেই হতে পারত না। তার আশাভরসা হাসিকান্না লাভক্ষতি

নিজের বাল্যগণ্ডীর মধ্যেই পর্যাপ্ত হয়ে ছিল।

তখন যদি বড়বয়সের কথা কল্পনা করতে যেতুম তবে তাকে বৃহত্তর বাল্য-জীবন বলেই মনে হত—অর্থাৎ রূপকথা, খেলনা এবং লজঞ্জুসের পরিমাণকে বড় করে তোলা ছাড়া আর কোনো বড়কে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করতুম না।

এ যেন ছবির ভাগে ক খ শেখার মত। কয়ে কাক, খয়ে খঞ্জন, গয়ে গাধা, ঘয়ে ঘোড়া। শুদ্ধমাত্র ক খ শেখার মত অসম্পূর্ণ শেখা আর কিছু হতেই পারে না। অক্ষর-গুলোকে যোজনা করে যখন শব্দকে ও বাক্যকে পাওয়া যাবে তখনই ক খ শেখার সার্থকতা হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে ক খ অক্ষর সেই কাকের ও খঞ্জনের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণতালাভ করে' শিশুর পক্ষে আনন্দকর

হয়ে উঠে—সে ক খ অক্ষরের দৈন্য অনুভব করতেই পারে না।

তেমনি শিশুর জীবনে ঈশ্বর তাঁর জগতের পুঁথিতে যে সমস্ত রংচং-করা কথয়ের ছবির পাতা খুলে রাখেন তাই বার বার উল্টে পাল্টে তার আর দিন রাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না—সে ছবি দেখেই খুসি হয়ে থাকে; মনে করে এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তারপরে আঠার বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম সেদিন খেলনা লজঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন যে ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের সমুখে এসে দাঁড়ালুম সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্‌ করচে এবং ভিতর থেকে যে একটি নহবতের আওয়াজ আসচে তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্চে। এতদিন ছিলুম বাইরে, কিন্তু সাহিত্যের

নিমন্ত্রণ-চিঠি পেয়ে মানুষের মানসলোকের রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা গেল। মনে হল, এই যথেষ্ট, আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এমনি করে মধ্য-যৌবনে যখন পৌঁছন গেল—তখন বাইরের দিকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তখন এই মানসলোকের বাহির-বাড়িতে ডাক পড়ল। মানুষ যেখানে বসে ভেবেছে, আলাপ করেছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে সেখানে নয়—ভাব যেখানে কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সেই মস্ত খোলা জায়গায়। মানুষ যেখানে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, যেখানে অসাধ্য-সাধনের জয়পতাকা হাতে অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নদী পর্ব্বত সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেইখানে। সেখানে সমাজ আহ্বান করছে, সেখানে দেশ হাত বাড়িয়ে আছে—সেখানে উন্নতিতীর্থের দুর্গমশিখর মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

থেকে সুমহৎ ভবিষ্যতের দিকে তর্জ্জনী তুলে রয়েছে। এই বা কি বিরাট্ ক্ষেত্র! এই যেখানে যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে এসেছেন, এখানে প্রাণ আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারলেই নিজেকে সার্থক বলে মনে করে।

কিন্তু এইখানে এসেই, যে, সমস্ত ফুরোয় তা নয়। এর থেকেও বেরোবার দরজা আছে। সেই দরজা যখন খুলে যায়—তখন দেখি আরো আছে, এবং তার মধ্যে শৈশব যৌবন বার্দ্ধক্য সমস্তই অপূর্ব্বভাবে সম্মিলিত। জীবন যখন ঝরণার মত ঝরছিল তখন সে ঝরণারূপেই সুন্দর—যখন নদী হয়ে বেরল তখন সে নদীরূপেই সার্থক—যখন তার সঙ্গে চারদিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে তখন মহানদরূপেই তার মহত্ব—তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে

সঙ্গত হল তখন সেই সাগরসঙ্গমেও তার মহিমা।

বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্রে ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর।

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে এই কথাই আমি চিন্তা করচি। আমি দেখচি তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর সামনে একটি অভাবনীয়; তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করচে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পঞ্চাশে পদার্পণ করে আমার সামনেও সেই অভাবনীয়কেই দেখচি। নূতন আর কিছুই নেই, শক্তির পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পথের

সীমায় এসে ঠেকেছি এ কথা কোনো মতেই বল্‌তে পারচিনে। আমি ত দেখচি আমিও একটি বিপুল বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। বাল্যের জগৎ, যৌবনের জগৎ, যা পার হয়ে এসেছি বলে মনে করেছিলুম এখন দেখছি তার শেষ হয় নি—তাকেই আবার আর-এক আলোকে, আর-এক অর্থে, আর-এক সুরে লাভ করতে হবে মনের মধ্যে সেই একটি সংবাদ এসেছে।

এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি অথচ চলেওছি। শিশুকালের যে পৃথিবী, যে চন্দ্র-সূর্য্য তারা, এখনো তাই—স্থান পরিবর্ত্তন করতে হয়নি, অথচ সমস্তই বেড়ে উঠেচে। দাশুরায়ের পাঁচালি যে পড়বে তাকে যদি কোনো দিন কালিদাসের কাব্য পড়তে হয় তবে তাকে স্বতন্ত্র পুঁথি খুল্‌তে হয়। কিন্তু এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে—

সেই পুঁথিকে শিশু পড়চে ছড়ার মত, যুবা পড়চে কাব্যের মত এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়চে ভাগবত। কাউকে আর নড়ে বস্‌তে হয় নি—কাউকে এমন কথা বল্‌তে হয় নি যে, এ জগতে আমার চল্‌বে না, আমি 'এ'কে ছাড়িয়ে গেছি—আমার জন্যে নূতন জগতের দরকার।

কিছুই দরকার হয় না এইজন্যে, যে, যিনি এ পুঁথি পড়াচ্চেন তিনি অনন্ত নূতন—তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পাঠকে নূতন করে নিয়ে চলেছেন—মনে হচ্চে না যে, কোনো পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

এই জন্যেই পড়ার প্রত্যেক অংশেই আমরা সম্পূর্ণতাকে দেখ্‌তে পাচ্চি—মনে হচ্চে এই যথেষ্ট, মনে হচ্চে আর দরকার নেই। ফুল যখন ফুটচে তখন সে এম্‌নি করে ফুটচে যেন সেই চরম; তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই। তার

কারণ হচ্ছে, পরিণত ফলের মধ্যে যাঁর আনন্দ, অপরিণত ফুলের মধ্যেও তাঁর আনন্দের অভাব নেই।

শৈশবে যখন ধুলো বালি নিয়ে, যখন নুড়ি শামুক ঝিনুক ঢেলা নিয়ে খেলা করেছি তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদিকালের ভগবান শিশু ভগবান হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে শিশু না হতেন এবং তাঁর সমস্ত জগৎকে শিশুর খেলাঘর করে না তুলতেন তাহলে তুচ্ছ ধুলোমাটি আমাদের কাছে এমন আনন্দময় হয়ে উঠ্‌ত না। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মত হয়ে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন—এই জন্যে শিশুর জীবনে সেই পরিপূর্ণস্বরূপের লীলাই এমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয়; কেউ তাকে ছোট বলে, মূঢ় বলে, অক্ষম বলে অবজ্ঞা করতে পারেনা—অনন্ত শিশু তার সখা হয়ে তাকে এমনি গৌরবান্বিত

করে তুলেছেন যে জগতের আদরের সিংহাসন সে অতি অনায়াসেই অধিকার করে বসেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

আবার সেই জন্যেই আমার উনিশ বৎসরের যুবা বন্ধুর তারুণ্যকে আমি অবজ্ঞা করতে পারিনে। যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল ধরে কত যুবাকেই যে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছেন তার আর সীমা নেই। তাই যৌবনের মধ্যে চরমের আস্বাদ পেয়ে চিরদিন যুবারা যৌবনকে চরমরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

প্রবীণরা তাই দেখে হেসেছে। মনে করেছে যুবারা এই সমস্ত নিয়ে ভুলে আছে কেমন করে? ত্যাগের মধ্যে রিক্ততার মধ্যে যে বাধাহীন পরিপূর্ণতা সেই অমৃতের স্বাদ এরা পায়নি। তিনি চিরপুরাতন যিনি

পরমানন্দে আপনাকে নিয়তই ত্যাগ করচেন, যিনি কিছুই চান না, তিনিই বুদ্ধের বন্ধু হয়ে পূর্ণতার দ্বার স্বরূপ যে ত্যাগ, অমৃতের দ্বার স্বরূপ যে মৃত্যু তারই অভিমুখে আপনি হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন।

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে না ধরা দিতেন তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তবে তিনি আমাদের কাছে "না" হয়েই থাক্‌তেন। কিন্তু পদে পদে তিনিই আমাদের হাঁ। বাল্যের মধ্যে যে হাঁ সে তিনিই, সেইখানেই বাল্যের সৌন্দর্য্য; যৌবনের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই—সেইখানেই যৌবনের শক্তি সামর্থ্য; বার্দ্ধক্যের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই—সেইখানেই বার্দ্ধক্যের চরিতার্থতা। খেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি এবং ত্যাগের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি।

এই জন্যেই পথও আমাদের কাছে এমন রমণীয়, এই জন্যে সংসারকে আমরা ত্যাগ করতে চাইনে। তিনি যে পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। পথের উপর আমাদের এই যে ভালবাসা এ তাঁরই উপর ভালবাসা। মরতে আমরা যে এত অনিচ্ছা করি এর মধ্যে আমাদের মনের এই কথাটি আছে যে, হে প্রিয়, জীবনকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছ।—ভুলে যাই যিনি প্রিয় করেছেন মরণেও তিনিই আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

আমাদের বলবার কথা এ নয় যে, এটা অপূর্ণ, ওটা অপূর্ণ, অতএব এ সমস্তকে আমরা পরিত্যাগ করব। আমাদের বলবার কথা হচ্চে এই যে, এরই মধ্যে যিনি পূর্ণ তাঁকে আমরা দেখ্‌ব। ক্ষেত্রকে বড় করেই যে আমরা পূর্ণকে দেখি তা নয়, পূর্ণকে দেখলেই আমাদের ক্ষেত্র বড় হয়ে যায়। আমরা যেখানেই আছি, যে অবস্থায় আছি সকলের মধ্যেই যদি তাঁকে

দেখবার অবকাশ না থাকত তাহলে কেউ কোনো কালেই তাঁকে দেখবার আশা করতে পারতুম না। কারণ, আমরা যে যতদূরই অগ্রসর হইনা, অনন্ত যদি ধরা না দেন তবে কোনো কৌশলে কারো তাঁকে নাগাল পাবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

কিন্তু তিনি অনন্ত বলেই সর্ব্বত্রই ধরা দিয়েই আছেন—এই জন্যে তাঁর আনন্দরূপের অমৃতরূপের প্রকাশ সকল দেশে, সকল কালে। তাঁর সেই প্রকাশ যদি আমাদের মানবজীবনের মধ্যে দেখে থাকি তবে মৃত্যুর পরেও তাঁকে নূতন করে দেখতে পাব এই আশা আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবজীবনে সে সুযোগ যদি না ঘটে থাকে, অর্থাৎ যদি না জেনে থাকি যে, যা কিছু প্রকাশ পাচ্চে সে তাঁরই আনন্দ, তবে মৃত্যুর পরে যে আরো কিছু বিশেষ সুযোগ আছে এ কথা কল্পনা করবার কোনো হেতু দেখিনে।

অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই একথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান্? নেতি নেতি করে জানান্ না—ইতি ইতি করেই জানান্। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই একথা জান্‌তে পারি সর্ব্বত্রই ইতি—সর্ব্বত্রই সেই এষঃ। জীবনেও সেই এষঃ, জীবনের পরেও সেই এষঃ।—কিন্তু তিনি নাকি অন্তহীন—সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনো দিন পুরাতন নন, চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জান্‌ব, নূতন করেই পাব, তাঁতে নূতন করেই আনন্দলাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মত একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম তাহলে অনন্ত পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব

এ কখনো হতেই পারে না! কিন্তু সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতররূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চল্‌ব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই, তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র।

মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি কোনো ইংরেজি বইয়ে পড়েছি, যে ঈশ্বরকে যে পিতা বলা হয়ে থাকে সে একটা রূপক মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের যে রক্ষণ পালনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য অবলম্বনে তাঁকে পিতা বলা হয়।

কিন্তু একথা আমরা মানিনে। আমরা তাঁকে রূপকের ভাষায় পিতা বলিনে। আমরা বলি পিতামাতার মধ্যে তিনিই সত্য পিতা মাতা। তিনিই আমাদের অনন্ত পিতামাতা, সেই জন্যেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চিরকাল পেয়ে আসচে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মানুষের পিতা মাতার মধ্যে আপনাকে

প্রকাশ করে আস্‌চেন। পিতার মধ্যে পিতারূপে যে সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে সত্য সে তিনি।

পিতামাতাকে যদি প্রাকৃতিক দিক্ থেকে দেখাই সত্য দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মর্ত্যজীবনের প্রাকৃতিক কারণ মাত্র যদি তাঁরা হতেন, তাহলে এই পিতামাতা সম্ভাষণকে আমরা ভুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্তু মানুষ পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড় জিনিষকে অনুভব করেছে—পিতামাতার মধ্যে এমন একটি পদার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ পিতামাতার সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে; পিতামাতার মধ্যে এমন একটা কিছু পেয়েছে, যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারাকে যিনি অনাদি-অনন্তকাল নিয়মিত করচেন সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে পিতানোঽসি—

তুমি আমাদের পিতা। একথা যে নিতান্তই হাস্যকর প্রলাপবাক্য এবং স্পর্দ্ধার কথা হত যদি এ কেবলমাত্রই রূপক হত। কিন্তু মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে বিশেষ ভাবে অনন্তের মধ্যে দেখেছে, এবং অনন্তকে বিশেষ ভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেই জন্যেই এমন দৃঢ় কণ্ঠে এতবড় অভিমানের সঙ্গে বল্‌তে পেরেছে "পিতানোঽসি।"

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে অমৃতের ধারা লাভ করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও তার সীমা নেই, দেখেছে যেখান থেকে সূর্য্যনক্ষত্র তাদের নিঃশেষহীন আলোক পাচ্চে, জীবজন্তু যেখান থেকে অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চলে আজ পর্য্যন্ত কোনো শেষে গিয়ে পৌঁছল না, সেই জগতের অনাদি আদি প্রস্রবণ হতেই ঐ অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আস্‌চে; অনন্ত ঐখানে আমাদের কাছে যেমনি ধরা পড়ে

গেছেন অম্‌নি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি "পিতানোঽসি"—বলেছি, যাকেই পিতা বলে ডাকিনা কেন, তুমিই আমাদের পিতা।

তুমি যে আমাদেরই, অনন্তকে এমন কথা বল্‌তে শিখ্‌লুম এইখান থেকেই। তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য কারবার নিয়ে তুমি আছ সে কথা ভাব্‌তে গেলেও ভয়ে মরি—কিন্তু ধরা পড়ে গেছ এইখানেই—দেখেছি তোমাকে পিতার মধ্যে, দেখেছি তোমাকে মাতার মধ্যে—তাই তুমি যত বড়ই হওনা কেন, পৃথিবীর এই এক কোণে দাঁড়িয়ে বলেছি, তুমি আমাদের পিতা—পিতানোঽসি। আমাদের তুমি আমাদের, আমার তুমি আমার।

এমন করে যদি তাঁকে না পেতুম তবে তাঁকে খুঁজ্‌তে যেতুম কোন্ রাস্তায়? সে রাস্তার অন্ত পেতুম কবে এবং কোন্‌খানে? যত দূরেই যেতুম তিনি দূরেই থেকে যেতেন।

কেবল তাঁকে অনির্ব্বচনীয় বল্‌তুম, অগম্য অপার বল্‌তুম।

কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় অগম্য অপার তিনিই আমার পিতা, আমার মাতা, তিনিই আমার,—মানুষকে এই একটি অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনধিগম্য, এক মুহূর্ত্তে এত আশ্চর্য্য সহজ হয়েছেন।

একেবারে আমাদের মানব-জন্মের প্রথম মুহূর্ত্তেই। মা'র কোলে মানুষের জন্ম এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই তার অধিকারের আর অন্ত নেই; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এত বড় স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জ্জন করতে হয় নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার

আপন হত না। মাতাই তাকে জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্য্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপ গ্রহণ করে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে—সে কে? এমনটা পারে কে? এ শক্তি আছে কার? সেই অনন্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

এই জন্যে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন, তখন জানা-শুনা চেনা-পরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার হয় না, তখন রূপগুণ শক্তি-সামর্থ্যের আসবাব আয়োজনও বাহুল্য হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন

করে হিসেব করে চিন্‌তে হয় না। চিরকাল তাঁর যে চেনাই রয়েছে, সেই জন্যে তাঁর আলো যেখানে পড়ে সেখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না।

শিশু মা বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখ্‌লে তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল—এস, এস। সেই ধ্বনি মা-বাপের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে এল কিন্তু সে কি মা-বাপেরই কথা? সেটি যাঁর কথা তাঁকেই মানুষ বলেছে "পিতানোঽসি।"

শিশু জন্মাল আনন্দের মধ্যে, কেবল কার্য্যকারণের মধ্যে নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুসি, মা-বাপকে নিয়ে তার খুসি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আরম্ভ হল। এই যে আনন্দ, এ আনন্দ ছিল কোথায়, এ আনন্দ আসে কোথা থেকে? যে পিতামাতার ভিতর দিয়ে শিশু এ'কে

পেয়েছে, সেই পিতামাতা এ'কে পাবে কোথায়? এ কি তাদের নিজের সম্পত্তি? এই আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই যেখান থেকে এসে পৌঁছল- সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হয় তখনই এত বড় কথা সে অতি সহজেই বলে—পিতানোঽসি—তুমিই আমার পিতা আমার মাতা।

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমাকে জানিয়েছেন আজ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাঁকে বল্‌চি আজ তাঁর মাতাকে খুব বড় করে দেখবার দিন, বিশ্বমাতার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখবার দিন।

মা যখন ইন্দ্রিয়-বোধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন তখন তাঁকে এত বড় করে দেখবার অবকাশ ছিলনা। তখন তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তাঁর সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে—যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য সেইখানেই আজ তাঁকে দেখে নিতে হবে।

যিনি জন্মদান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়সাধন করিয়েছেন আজ তিনি মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে দিয়ে সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মূর্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে দিন।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি, শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে একটি মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে দেখা কানে শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারিনে।

আমার চোখে দেখা কানে শোনা দিয়েই ত আমি জগৎকে সৃষ্টি করিনি যে আমার দেখা শোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে

যাবে। যাকে চোখে দেখ্‌ছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জান্‌চি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখিনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানিনে, তখনো তাঁরই মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা ত ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আমি যাকে দেখ্‌চিনে, তিনি তাকে দেখ্‌চেন—আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়চেনা।

সেই অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের দেখার মধ্যেই আজ মাকে দেখ্‌তে হবে। আজ এই শ্রদ্ধাটিকে হৃদয়ে জাগ্রত করে তুল্‌তে হবে, যে, মা আছেন, মা সত্যের মধ্যে আছেন; শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে, যে, মা আছেন, তিনি কখনই হারাতে পারেন না। সত্যের মধ্যে মা চিরকাল ছিলেন বলেই তাঁকে একদিন পেয়েছি—নইলে একদিনো পেতুম না—এবং

সত্যের মধ্যেই মা আছেন বলেই আজও তাঁর অবসান নেই।

সত্যের মধ্যেই অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে এ কথা আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থতঃ উপলব্ধি করি। যাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহপ্রেমের আমাদের জীবনের গভীর যোগ নেই তারা আছে কি নেই তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না—সুতরাং মৃত্যুতে তারা আমাদের কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলেই জানি।

কিন্তু এ মৃত্যুর অর্থ কি ভেবে দেখ। যে-মানুষকে আনন্দের মধ্যে দেখিনি তাকে অমৃতের মধ্যেই দেখিনি—আমার পক্ষে সে কেবল মাত্র চোখে-দেখা কানে-শোনার অনিত্য লোকেই এতদিন ছিল;—যেখানে তাকে সত্যরূপে বৃহৎরূপে অমররূপে দেখ্‌তে পেতুম সেখানে সে আমাকে দেখা দেয় নি।

যেখানে আমার প্রেম সেইখানেই আমি নিত্যের স্বাদ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ চলে যায়, মানুষের মূল্যের সীমা থাকেনা। সেই প্রেমের মধ্যে যে মানুষকে দেখেছি তাকেই আমি অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে তার মধ্যে অসীমকে দেখতে পাই, এবং মৃত্যুতেও সে আমার কাছে মরে না।

যাকে আমরা ভালবাসি মৃত্যুতে সে যে থাক্‌বে না এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে;—প্রেম যে তাকে নিত্য বলেই জানে, সুতরাং মৃত্যু যখন তার প্রতিবাদ করে তখন সেই প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে এতই কঠিন হয়ে ওঠে। যে মানুষকে আমরা অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখ্‌ব কেমন করে?

মনের ভিতরে তখন একটি কথা এই

ওঠে—প্রেম কি কেবল আমারই? কোনো বিশ্বব্যাপীপ্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়? যে শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালবাসচি আনন্দ পাচ্চি সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না? আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য—সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই? তাঁর সেই অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠিনি? যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই?

প্রিয়জনেরই মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই ত আমাদের শ্রদ্ধার দিন,—সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন

করি; আমরা বলি, মাকে দেখ্‌চিনে কিন্তু মা আছেন। চোখে দেখে হাতে ছুঁয়ে যখন বলি মা আছেন তখন সে ত শ্রদ্ধা নয়— আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শূন্যতার সাক্ষ্য দিচ্চে সেখানে যখন বলি মা আছেন তখন তাকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে যতক্ষণ পাহারা দিচ্চি ততক্ষণ যাকে বিশ্বাস করি তাকে কি শ্রদ্ধা করি? গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল তারই উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকার-ময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করচে, তাকেই ত যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন। মাতার জীবিতকালে যখন বলেছি, মা তুমি আছ—তার চেয়ে ঢের পরিপূর্ণ করে বলা, আজকের বলা—যে, মা তুমি আছ। তার মধ্যে আর একটি গভীরতর শ্রদ্ধার

কথা আছে—"পিতানোঽসি।" হে আমার অনন্ত পিতামাতা তুমি আছ, তাই আমার মাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই।

যে দিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন—সেই দিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্চে :—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নোবনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দ-মন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যং—তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য এই শ্রদ্ধা যে দিন

পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেই দিনই আমরা বল্‌তে পারি আনন্দং—তিনি আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

———

শেষ

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই যে লেখা চল্‌চে এই লেখার অন্য সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়ি গুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে—এ'কে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্চে না।

বস্তুত কবিতা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেন না কোনো ভাল কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না—যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে—এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একেবারেই

ফুরিয়ে যায়, তাহলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো একটা বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে—তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল এক দিক থেকে থামা অন্য দিক্ থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এই রকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায় মানুষ থাম্‌তে লজ্জা বোধ করে। সেই জন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুনতে পাই যে, জিন্‌লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

কোনো একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে একথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিষ বলে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

কিন্তু ভোগের বা দানের মধ্যে সঞ্চয় যখন আপনাকে ক্ষয় করতে থাকে তখন এক আকারে সঞ্চয়ের অবসান হয় বটে কিন্তু আর এক আকারে তারই সার্থকতা হতে থাকে। যেখানে সঞ্চয়ের এই সার্থক অবসান নেই সেখানে লজ্জাজনক কৃপণতা।

জীবনকে যারা এই রকম কৃপণের মত দেখে তারা কোথাও কোনো মতেই থাম্‌তে চায় না, তারা কেবলি বলে, চল, চল, চল। আমার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না—তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।

তারা যৌবনকে যৌবন পেরিয়েও টানাটানি করে নিয়ে চলে—সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কাঠ খড় এবং চেষ্টার আর অবধি থাকে না—তা ছাড়া কত লজ্জা কত ভাবনা কত ভয়।

ফল যখন পাকে তখন শাখা ছেড়ে যাওয়াই তার গৌরব। কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি সে দীনতা বলে মনে করে তবে তার মত কৃপাপাত্র আর কে আছে।

নিজের স্থানকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনের মধ্যে রাখ্‌তে হবে যে, এই অধিকারকে সম্পূর্ণ করে তুলে এ'কে ত্যাগ করে যাব—এই অধিকারকে যেমন করে পারি শেষ পর্য্যন্ত টানা হেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে—তাতেই আমার সম্মান আমার কৃতিত্ব এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিখে এসেছে অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মত এসে জোর করে টেনে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এই জন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এই জন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেন না সেই ত্যাগ বল্‌তে ত রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে ত ব্যর্থতা বল্‌তে পারিনে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হয়—সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু সে বন ত আলস্যের বন নয়, সে যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা, দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়,

হওয়ার আদর্শই খুব বড় জিনিষ। ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল সে খুব সুন্দর কিন্তু ফসল ফলে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন আরম্ভ হয়, তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধান ক্ষেতের সমস্ত রৌদ্র বৃষ্টির ইতিহাস নিবিড় ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে বলে কি তার কোনো অগৌরব আছে ?

মানুষের জীবনকেও কেবল তার ক্ষেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখব না, এমন পণ করলে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়। তাই বলচি মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে জিনিষটা আদায় করি তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিষটাই দাবী করি তাহলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয় নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবী করতে পারি সেটা করার আদর্শ নয়, সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চল্‌চে, কেবলি ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখতে পাইনে—যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবটি এই স্থিররূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে। ক্ষেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে—এই জন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে সমাজে যে রকম দাবী সেই দাবী অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবী করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ

করে যোদ্ধা হবার জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবী অতিমাত্র, সেখানে অন্তিমমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বল্লেই হয়, সেখানে কেবলি অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে জায়গায় থামে সে জায়গায় কিছুই পায় না কেবল লজ্জা পায়,—সেখানে কাজ একটা মদের মত, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শত সহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

সামঞ্জস্য

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্চি সে হচ্চে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক্, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্চে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক্, কোন জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং স্ফূর্ত্তি, স্পন্দন এবং নর্ত্তন, অথচ সর্ব্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করচে, সূর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে কোন এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই—আমরা সকাল বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে একথা

নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেমনি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য ত সহজ সামঞ্জস্য নয়—এ ত মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো! এই জগৎক্ষেত্রে যে সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা—কেউ বা পিছনের দিকে টানে কেউবা সামনের দিকে ঠেলে, কেউ বা গুটিয়ে আনে, কেউবা ছড়িয়ে ফেলে, কেউ বা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দচ্চে, কেউবা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্ত্তে

সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্‌দিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। এই সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেশে এবং অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে, তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত ; কিন্তু এই সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখ্‌তে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্চে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তং, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্য সাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে—

এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে; কখনই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে। "এষ সেতু র্বিধরণ লোকানামসম্ভেদায়।"

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্‌গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্ব্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্ব্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই, কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি এই ধারণা

বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায় এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়াল সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়াল, সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিককালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠ্‌ল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে

অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চল্‌চে, তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক, এই তাঁদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের

পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য, এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এম্‌নি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে এতবড় একটা বিচ্ছেদ কখনই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না, কী রাষ্ট্রতন্ত্রে, কী সমাজতন্ত্রে, কী ধর্ম্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে হৃদয়পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল।

এখন আবার সকলে একেবারে উল্টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগল। তাঁর আর সমস্তকেই খর্ব্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগ-চাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগ্‌ল এবং সেই রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাব-বিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এই রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে

দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনই মানুষ এমন কথা অনায়াসে বল্‌তে পারে যে, ভক্তিপূর্ব্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক্‌ না কেন তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ যেন, পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষ্যটা যাই হোক্‌, ভক্তির প্রবলতা দেখ্‌লেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়—কারণ প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে ত একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিক্‌কে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে; তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চ্চায় মানুষ কখনই মনুষ্যত্বলাভ করেনা এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ্য হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মত ক্রমশই উগ্র

হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কা'কে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল ;—জগদ্ব্যাপারের সর্ব্বত্রই একটা জ্ঞানের, ন্যায়ের, নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দ্দিকে ধূলিসাৎ হতে চল্‌ল; তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একটা বৈদিক যুগে কর্ম্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্ম্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা

জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল ; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই, দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না ; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বল্লেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্ম্মই চূড়ান্ত ছিল ; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করেনি, তার পরে যখন জ্ঞান বড় হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম্ম উভয়কে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল

তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্ম্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটী সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোট করে দিলে, এমন কি ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্য্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তিসাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার সর্ব্বাংশের ক্ষুধা একদিন না-জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো

নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্ সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব্বসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্ম্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা

সহজ কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিষ জগতে অনেক আছে—কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয় যে সত্য চায়, সে ত ভুল্‌তে চায়না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরতেই হবে—তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে—কিন্তু উপায় নেই—তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসামাত্র নয় কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়—এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা

আছে ;—তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয় আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল—ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন—এই জন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত্ত তিনি থাম্‌তে পারেননি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হননি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডীর

মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেই জন্যেই এদেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী!

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি একথা বুঝেছেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়— শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয় রসে পাওয়া যায় কেননা সমস্ত রসের সার তিনি—রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয়-দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন :—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য-প্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে ফিরে আসে কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা, মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে ;—সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাক্‌তে পারে না। সে একথা কাউকে বলে না যে, তুমি দুর্ব্বল, তোমার সাধ্য নেই, কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়,—আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না—পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক্ না এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন—আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র

আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক্ থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক্ থেকে নয় এই জন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্ম্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতারি বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনো মতে তাঁর কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কা'কে চাচ্চেন তা ভাল করে জানবার পূর্ব্বেই

তাঁকেই চেয়েছিলেন, জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জান্‌তে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এই জন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন, পরিমিত পদার্থের মত করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মত যাঁকে না-পাওয়া যায় না—যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব্ব করতে হয় না অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না—যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট নন, যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানিনে সেও তাঁকে জানেনা। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্চে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন ভগবৎ-পিপাসা যখন

তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল! অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগ্‌লেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্— তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্য্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্চে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্য্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখে-

ছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুতঃ যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন তেমনি পারস্যের সৌন্দর্য্যকুঞ্জের বুল্‌বুল্‌ হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনে আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোক-গুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের

সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্য্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেম্‌নি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলি রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্ম্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা

সত্ত্বেও এই রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করেনি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশ বাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্ম্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হোক্ নির্জ্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি।—তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়, তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম ;—নির্জ্জনে

তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা, অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা এ'কেই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে

তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। একথা মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্ম্মে যেখানে যথার্থ বীর্য্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্য্যাতন স্বীকার করে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ

করে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করিনি। দুর্ব্বলতা বশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্ব্বলতা এপর্য্যন্ত কেবলি বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন—তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্ব্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারই মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতি-দুর্গের যে রুদ্ধদ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে, আপনার ধর্ম্মকে সমাজকে আপনার আচার ব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আস্‌তে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়ের সঙ্কোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠচে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য-ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্চে, সেই-খানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্চে, সেইখানেই

অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্চে এবং সেইখানেই প্রবল-বেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্চি—এই রকম সময়েই যে সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে করে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে, যে বিশ্লিষ্টতা এদেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলচে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ

সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদকাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন ; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সমাঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্য্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না, ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্ম্মে, কি বিষয় কর্ম্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না ; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে

সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত যাহাকিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, তার কোন অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার বা সৌন্দর্য্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটবড় এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন করে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্য্যন্ত দেখা গেছে তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি—সর্ব্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসী পর্ব্বতে একবার গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম

এক দিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যা-ত্যাগ করে পার্ব্বত্যগৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বস্‌তেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করতেন— তেমনি আবার জ্ঞান আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিন খানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনের রোমের ইতিহাস ছিল—তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্ম্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা কিছু পরিণতি ঘট্‌চে সমস্তই মনে মনে পর্য্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্ব্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসার-যাত্রায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে ;— গুরুবাদ ও

অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গী-রূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সামালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্ব্বদা কি রকম জাগ্রত ছিল তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক স্ট্রীটে বাস করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়া-সাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্ক স্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বল্লেন, দেখ আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি ; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্চি কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবে না।—আমি বেশ বুঝতে পারলুম শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্ত্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি

যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল— সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণ চিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্য্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকৃতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় করে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত, হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক্! তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম

আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়চে, এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করচে। সকল শক্তি সকল কর্ম্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হোক্! কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্ব্বল যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্ত্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়—সেই-খানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে;—আমাদের দেশেও তেমনি করে

দুর্ব্বলতাব সমস্ত লক্ষণ ধর্ম্মসাধনায় ও কর্ম্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্ব্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে; সকল প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসঙ্গত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদেব চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলচে; নিজেব দুর্ব্বল বুদ্ধি ও দুর্ব্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্ব্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি, সেই জন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সঙ্কোচমাত্র বোধ

করিনে এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার চির-প্রচলিত আচার বিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেই জন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলি নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্ব্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্ব্বেই দুটি একটি করে ভক্ত বিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চম স্বরে আনন্দবার্ত্তা ঘোষণা করচে, আজ আমরা দেশের নব উদ্বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ম্ময় কল্যাণসূর্য্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

জাগরণ

প্রতিদিন আমাদের যে আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বলবেশ প'রে আমাদের সকলের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন—জাগো, আজ, আশ্রমবাসী সকলে জাগো!

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে বিশ্বের কত হাজার রকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌তে থাকে তখনি আমাদের জাগা;—আমাদের শক্তির

সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুইদিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মার্‌চে, বল্‌চে জাগো। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আস্‌চে বল্‌চে জাগো। যেখানে সেই বড়র আহ্বানে আমাদের ছোটটি তখনি সাড়া দিচ্চে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়চে, প্রত্যেক তারটিকেই বল্‌চে, জাগো। যে তারটি জাগ্‌চে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সঙ্গীত। যে তার শিথিল, যে তার জাগচে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সঙ্গীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগ্‌তে জাগ্‌তে এসেছি তা কি আমরা জানি! প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা কি আমাদের স্মরণ আছে? জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দ্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে—মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে? অন্তরের মধ্যে আমাদের এই যে জাগরণ, এই যে নানাদিকের জাগরণ, গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা ত এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ, যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন—তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহ-

দ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন—এই মনুষ্যত্বের মুক্তদ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করচে—সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না—ঘুমের সব আবরণগুলি খুলে যেতে না যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল স কৃপণঃ, সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ? গোড়াতেই ত আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা! আমাদের চোখকান আমাদের হাত-পা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ করে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মধ্যে এমন কয় জন আছে? তারপর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে—বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক

পড়েছে—যেখানে সাড়া দিচ্চে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্চে—যেখানে সাড়া দিচ্চে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্মউপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্চে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহাউদ্বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে—বল্‌চে, ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড় করে জান! বল্‌চে, নিজের কৃত্রিম-আচারের কাল্পনিক বিশ্বাসের অন্ধ-সংস্কারের তমিস্র আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি—যে জাগরণে

আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সঙ্কোচ বিদীর্ণ করে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি—সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরব রাগিণীর প্রভাতীগান ধরেছেন—আজ আমাদের উৎসব সার্থক হোক্।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোট আর-একদিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটাতে আমি কেবল মাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা···-যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সে দিকটাতে আমি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মত ছোট আর কে আছে! আর যে দিকে আমার

সঙ্গে সমস্তের যোগ,আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যে দিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শত সহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ির সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে, —আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোক-লোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি ; সেইখানে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে ! এই বড়র দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটর দিকে কখনই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহঙ্কারের অতীত সেই আমার বড়-আমিকে সকলের চেয়ে বড়-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্চে আমাদেব বড় দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা' আর-কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্চে এই যে আমিত্ব বলে একটি জিনিষ এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জান্‌চি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগচে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্চি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্চেন উনি। পৃথক্ না

হলে মিলনও হয় না। তাই দেখতে পাচ্চি সমস্ত জগৎজুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলি পরস্পর বোঝাপড়া করচে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা;—তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলচে আর-এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্চে। এম্‌নি করে আমি এবং আমি-নার মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার ভাঁটা চলেচে। এমনি করে আমি আমাকে জান্‌চি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানচি এবং সকলকে জানচি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানচি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে বলে আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব! যেদিকে সে পৃথক্ সেইদিকে

তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ সেইদিকে তার পাপ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার ত্যাগ সেদিকে তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেই দিকেই তার কঠোর অহঙ্কার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্য্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আরএকদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্চে দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রার্থনা ; অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন ঃ—

যব হম রহল রহা নাহিঁ কোঈ,

হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ এই আমি

একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্চে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেল্‌তে চাননা, এ'কে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী; এ'কে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্চেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠ্‌চে। অথচ এই অন্তহীন আমি মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ, যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেই জন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই আমার মত তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরের

সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেই জন্যেই আমাকে নইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেই জন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেই জন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোটো হয়ে সংসারী হয়ে সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড়দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কি করে? তাই প্রতিদিনের মধ্যে মধ্যে এক একটি বড়দিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়দিনগুলি হচ্ছে সেই

প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড় দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়দিনগুলি সূর্য্যকান্ত মণির মত গাঁথা হয়ে যাচ্চে; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বলছিলুম আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে; আজ, নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রসনচৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজ্‌চে, কেবলি বাজ্‌চে, ভোর থেকে বাজচে। আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দক্ষেত্র। কেন? কেন না, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চল্‌চে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের

সেই বড় কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সঙ্গীতটি আজ কে বাজাবেন? সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্চে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুল্‌চেন; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদ-মিলনের ঝঙ্কারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলি উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়চে; একই ধ্রুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্চে, এবং একই ধ্রুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্চে।

বীণার তারগুলো যখন বাজেনা তখন

তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অম্‌নি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়—তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্য্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক, কেউবা লোহার কেউবা পিতলের তবু এক, কেউবা সরু সুরের কেউবা মোটা সুরের তবু এক—তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায়, দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হোক্ গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে সংসারের বীণাতে প্রতিদিন তার বাঁধা চল্‌চে, সুর বাঁধা

এগচ্চে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর! তখন চেষ্টার মূর্তি কষ্টের মূর্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে এক এক সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে!

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয় তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই—কেবলি বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন কেবলি খেটে মরা, কেবলি ওঠা পড়া, কেবলি অহং যন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া—কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই—কেবলি দিনযাপন মাত্র!

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে তিনি কেবলি কি কঠিন হাতে নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই

বাঁধ্‌চেন? তা ত নয়! সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কারও দিচ্চেন। কেবলি নিয়ম? তা ত নয়! তাব সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ! প্রতিদিন খেতে হচ্চে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠ্‌চে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মান্‌তে হচ্চে বটে কিন্তু সেই মেনে চলবাব চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠচে। দায়ও যেমন কঠোর, খুসিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদেব হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্চে ঐ! তিনি সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে ক'টি তার বাঁধা হচ্চে, তাতে যে ক'টি সুর বাজে কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুল্‌তে পারেন। পাপী হোক্ মূঢ় হোক্ স্বার্থপর হোক্ বিষয়ী

হোক্, যে হোক্ না, বিশ্বের আনন্দের একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়? তা হলেই হল; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝঞ্ঝনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা কোনো সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহঙ্কারের সঙ্গে যার মিল নেই—যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে, যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে, সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতি ক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই সুরে

সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকিয়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজেনা তখন আমরা ধূলির ধূলি, তখন আমরা প্রকৃতির অতি ভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে

বাতাসকে আলোকে সূর্য্যকে চন্দ্রকে পর্ব্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড় বলে দেবতা বলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সঙ্কল্প সঙ্কীর্ণ, আমাদের আশা ছোট, আকাঙ্ক্ষা ছোট, বিশ্বাস ছোট, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোট। তখন কেবল খাও, পর, সুখে থাক, হেসে খেলে দিন কাটাও এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সুর যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে তখনি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বাধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্য্যের দর্শক, জগৎঐশ্বর্য্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দ-ভাণ্ডারের অংশী—তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সঙ্গীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই! আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি, মর্ত্ত্যজীবনকে অনন্ত-জীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে! কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখ দুঃখের, জন্ম মৃত্যুর আলোক অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত অভিঘাতে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! ধন্য আমার প্রাণ, যে, সেই অনন্ত আনন্দ-সঙ্গীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে

আছে ; এই আমিটুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মীড়ের পর মীড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজ্‌চে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্চে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠ্‌চে ; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মত এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌চে। কি সুন্দর আমি! কি মহৎ আমি! কি সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মন প্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধরে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার

বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সঙ্কোচ নেই; কোথাও সঙ্কোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই;—স্বার্থের সঙ্কোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সঙ্কোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সঙ্কোচ—কিছুমাত্র না! সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্ করচে তার উপর বিশ্বপতির আঙুল যখন যেম্‌নি এসে পড়চে অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠ্‌চে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্চে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্ম্মরিত হয়ে উঠ্‌চে, পশুপক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিল্‌চে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্চে না; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে সকল ধর্ম্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ, সূর্য্যের সহস্র কিরণের মত অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। সর্ব্বত্রই সে জাগ্রত;

সে সচেতন, সে উন্মুক্ত ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানিনে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যত দিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জানচি, ছোট চিন্তায় ছোট বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্চে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্ম্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারিদিকে শ্রী নেই, ততদিন তোমার জগদ্ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্চে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার

অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করছি ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই, ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলে গণ্য করি, ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারিনে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই, ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মত আপনাকে কেবলি পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চাই ; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলিনে, ধর্ম্ম বাঁচিয়ে চলিনে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলিনে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না—চতুর্দ্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্য-বিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি

আমার আত্মা পরিপূর্ণশক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্ব্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি—কঠিন এবং প্রবল সঙ্কল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারিনে;—কী অব্যবস্থাকে কী অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত হইনে পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারিনে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে মনে গৃহে গ্রামে সমাজে স্বদেশে সর্ব্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব

ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হোক—আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্বোধনের বিপুলবাণী উদ্‌গীত হতে থাক্, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ম্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি, আনন্দ-সঙ্গীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-চেষ্টায়, হে রুদ্র! তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক্! আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল—তোমার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য

দাঁড়িয়েছি ; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্য্যের আলোক, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আমাদের মন্ত্র, অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই, আমরা মান্‌বনা পরাভব, আমরা জান্‌বনা অবসাদ, আমরা কর্‌বনা আত্মার অবমাননা, চল্‌ব দৃঢ়পদে, অসঙ্কুচিত চিত্তে—চল্‌ব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে—তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে, চারিদিক থেকে আহ্বান আস্‌তে থাকবে, এস, এস, এস,—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরজীবনের সিংহদ্বার—কল্যাণ, কল্যাণ, . কল্যাণ—অন্তরে বাহিরে কল্যাণ,—আনন্দং আনন্দং, পরিপূর্ণমানন্দং !

শান্তিনিকেতন

(ত্রয়োদশ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর
মূল্য চারি আনা

প্রকাশক
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

শান্তিনিকেতন

কর্ম্মযোগ

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্চে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বল্‌চে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে—দেখচি, যা কিছু সব নিয়মেই চল্‌চে এর মধ্যে আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাসচে।

সূর্য্যচন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠ্‌চে অস্ত যাচ্চে যে, মনে হচ্চে তারা যেন ভয়ে চল্‌চে পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয় যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই— সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয়, সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাইনে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সাম্‌নে দেখে আমরা চম্‌কে উঠি তাকেও জোড়-হাতে নিয়ম পালন করে চল্‌তে হয় একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে"—তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে, বাতাসও মুক্ত নয়;

"ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"— তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্রসূর্য্য চল্‌চে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাটবার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে বলে মনেও হয় না সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চল্‌চে।

তবে ত দেখ্‌চি ভয়েই সমস্ত চল্‌চে কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানা-ঘরে আগাগোড়া কল চল্‌চে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু ত আজ আনন্দের সুর উঠেছে এ কথা ত কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে ত মানুষ এমন করে ডাকে, বলে চল্‌ ভাই আনন্দ করবি চল্? এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন?

সে দেখ্‌তে পাচ্চে, নিয়মের কঠিন দণ্ড

একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুটতে দেখিনি ? দেখিনি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য ? দেখ্‌চিনে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা ?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরমরূপে প্রচার করচে না—একটি অনির্ব্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারিদিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্চে। সেই জন্যেই, যে উপনিষৎ একবার বলেছেন, অমোঘ শাসনের ভয়ে যা কিছু সমস্ত চলেছে, তিনিই আবার বলেছেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জায়ন্তে" আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্চে। যিনি আনন্দস্বরূপ মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করচেন ।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাঁধন মানে। কিন্তু যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্বোধন হয়নি, সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখ্‌চি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায়—কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না—সে বলে রস কিছুই নেই; সে মাথা নেড়ে বল্‌চে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু ঐ যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে—রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখতে পাচ্চেন। জগতের নিয়ম ত তাঁর কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্চে না, তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" জগতে তিনি

ভয়কে দেখ্‌চেন না, আনন্দকেই দেখ্‌চেন সেই জন্যেই বল্‌চেন "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্ব্বত্র জানতে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি করে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন—তিনিই বলেছেন "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" এই মহদ্ভয়কে এই উদ্যত বজ্রকে যাঁরা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয় কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন,—সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজবন্ধনের মত; তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুসি হয়ে গ্রহণ করে, কোনো-

টাকেই এড়াতে চায় না, কেননা সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাঁধে, তাকে মারে, সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনি সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট শিশুর মত কেঁদে উঠে বলে "মা মা হিংসীঃ," আমাকে আঘাত কোরো না। সে বলে বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তরে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো, আমাকে আচ্ছন্ন করে, আবৃত করে বেঁধে রাখো, কোথাও কিছু ফাঁক রেখোনা—শক্ত করে ধর, তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি—আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা কর।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্ম্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্ম্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্ম্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্ম্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করচে, তাই যদি না হত তাহলে কখনই সে ইচ্ছা করে কর্ম্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম্ম করচে ততই সে

আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুল্‌চে, ততই সে আপনার সুদূরবর্ত্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আস্‌চে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলি স্পষ্ট করে তুল্‌চে—মানুষ আপনার নানা কর্ম্মের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানাদিক থেকে দেখতে পাচ্চে।

এই দেখ্‌তে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মত ভয়ঙ্কর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্চে। আমাদের আত্মাও অনির্দ্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলি কর্ম্ম সৃষ্টি করচে।

যে কর্ম্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয় তাকেও কেবলি সে তৈরি করে তুল্‌চে। কেননা সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখ্‌তে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্য্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য্য—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে, সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করে না। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্য্যকে, মঙ্গলকে, নিজের

আত্মাকে নানাবিধ কর্ম্মের ভিতরে কেবলি বন্ধনমুক্ত করে দিচ্চে। যতই তাই করচে, ততই আপনাকে মহৎ করে দেখ্‌তে পাচ্চে—ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে।

উপনিষৎ বলেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্চে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনো দিন দুর্ব্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম্ম কেবলি বন্ধন। দুর্ব্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্ব্বেই খসে যায়—তাঁরা তেমন নন্। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়চিনে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে

প্রকাশ করবার জন্মে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ-দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মত সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করচে—তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে ;—তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্য্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তরবাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই যে জীবনের আনন্দ,

এই যে কর্ম্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। একথা বল্‌তে পারব না এ আমাদের মোহ, একথা বল্‌তে পারব না যে এ'কে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্ম্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্ম্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্ম্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্য-দৃষ্টিতে দেখ। যদি তা দেখ তাহলে কর্ম্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে? তাহলে আমরা দেখ্‌তে পাব কর্ম্মের দুঃখকে মানুষ বহন করচে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য কর্ম্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করচে, বহু ভার লাঘব করচে; কর্ম্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেল্‌চে অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম্ম করচে,—তার একদিকে দায় আছে, আর

একদিকে সুখও আছে; কর্ম্ম একদিকে অভাবের তাড়নায়, আর একদিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করচে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্ম্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করচে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে—নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে মারচে। কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠ্‌লনা;—পশুপক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্চে তাতেই সে চুপ করে থাক্‌তে পারলে না,—কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। মানুষের মত কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে

হয়েছে; এখানে কতকাল থেকে সে কত ভাঙচে গড়চে, কত নিয়ম বাঁধ্‌চে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্চে, কত পাথর কাটচে কত পাথর গাঁথচে, কত ভাব্‌চে কত খুঁজ্‌চে কত কাঁদ্‌চে; এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড় বড় লড়াই লড়া হয়ে গেছে; এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে, এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়; এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায়নি নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে; এইখানেই মানুষ সেই মহত্তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারিদিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক বড়, এই জন্যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়—সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না—এই জন্যই, তার বর্ত্তমানকে

ভেদ করে বড় হবার জন্যই, এখনো সে যা হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলি বারবার দুঃখ পেতে হচ্চে; সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব; এই কথা মনে রেখে মানুষ আপনার কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে নি; কেবলি তাকে প্রসারিত করেই চলেছে; অনেক সময় এতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পড়েচে যে, কর্ম্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্চে, কর্ম্মের স্রোতে বাহিত আবর্জ্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক একটা কেন্দ্রের চারদিকে ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত রচনা করচে, স্বার্থের আবর্ত্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত্ত, ক্ষমতাভি-মানের আবর্ত্ত; কিন্তু তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই, সঙ্কীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে; কারণ চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে

আর সে লড়াই করে উঠ্‌তে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম্ম করতে হবে, কর্ম্ম করে বেঁচে থাকতে হবে এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম্ম করা এবং বাঁচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্চে এই, যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই; তাকে বাইরে আস্‌তেই হবে। তার সত্য অন্তরে এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাক্‌তে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয় তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখনা কেন, শরীরকে ত নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয়; এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই। তবু

দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের কাজ করেও স্থির থাকতে পারে না। তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্ত চলাচলেই তার তুষ্টি নেই, নানাপ্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবল-মাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্ব্বদাই তার চাই—কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে—দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ, সেই ব্রহ্মকে ত্যাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচিনে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যেদিকে ত্যাগ করব সেইদিকে নিজেকেই বঞ্চিত

স্মরণ। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেননি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব বাইরের কর্ম্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব, কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না—কিম্বা একেবারে এর উল্টো কথাটাই বলি, এবং এই বলে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল একদিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি তাহলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখ্‌চি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত

ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য, সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভাল করে বিশ্বাসই করে না। এতদূর পর্য্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলচে বিশ্বজগৎ কেবলি পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে, জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠচেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলচেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি আর একদিকে সমাপ্তি; একদিকে পরিণতি, আর একদিকে পরিপূর্ণতা; একদিকে ভাব আর একদিকে প্রকাশ—দুই একসঙ্গে, গান এবং গান-গাওয়ার মত অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা

তারা দেখতে পাচ্চে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা, যে, গান কোন জায়গাতেই নেই কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে। কেন না, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখচি, কোনো সময়েই ত সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখচিনে—কিন্তু তাই বলে কি এটা জানিনে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র করে যাওয়া চলে যাওয়ার দিক্‌টাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্যজগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে এই পণ করে বসে আছে—তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ্—জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে

স্বীকার করে না—সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানে না।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে ব্যাপ্তির দিককে আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখব না এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে

করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্ব-নিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থানু হয়ে বসে আপনাকেই আপনি নিরীক্ষণ করতে চায়, আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধূলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও দুর্ব্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখিনি—আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে, তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ইতিহাস পুরাণ সমাজ সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত

হয়ে থাকি, আর কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁৎভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখিনে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের একদিকে নিয়ম, একদিকে আনন্দ। তার একদিকে ধ্বনিত হচ্চে ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, আর একদিকে ধ্বনিত হচ্চে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়স্তে। একদিকে বন্ধনকে না মান্‌লে অন্যদিকে মুক্তিকে পাবার জো নেই। ব্রহ্ম একদিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর একদিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনি মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতর? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বয়ং তত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয়

তখন সেই তারে গান বাজে, এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। একদিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্যদিকে সে সঙ্গীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয়নি ততক্ষণ সে কেবল-মাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না—সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে পারলেই সে বদ্ধ থেকেও এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্ম্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু তাই

বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে ব্যর্থতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা লাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বল্‌ছিলুম, কর্ম্মকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মকেই চির-দিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্চে সত্যের সাধনা, ধর্ম্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্চে—যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে—অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাক্‌বে—অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মারি গান, এই হচ্চে আত্মার মুক্তি। তখন কি আনন্দ যখন সকল কর্ম্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে—কর্ম্মে যখন আমাদের আত্ম-সমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে—সেই

পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ,—তখন সংসারই ত আনন্দনিকেতন।

কর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে এঁকে কে অবজ্ঞা করতে চায়, সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানব-মাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করচে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্ম্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনি শুনতে কি পাচ্চনা, ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জ্জনে আপনার কর্ম্মের বিজয় রথে,—চলেছে বিশ্বের মধ্যে

আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্ব্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্চে; বনজঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্য্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মত তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করচে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্চে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করচে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেল্‌চে—তার চারিদিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্ম্মের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্চে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই যে বিজয় পথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বল্‌তে চাও তার কেউ সারথী নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্চেনা?

এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথীর যথার্থ মিলন ঘট্‌চে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্য্যোগও সেই সারথীর অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারচে না—মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্চে না;—আলোকে অন্ধকারে চলেচে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথীর—চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নাববার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথীর। ওরে কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়; তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চল্‌তে চায় না! কে বল্‌তে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিল্‌ব। কে বল্‌তে চায় এই সমস্তই মিথ্যা, এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্য-

বিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তরবাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা। যে লোক এ সমস্তকেই মিথ্যা বলে কত বড় মিথ্যা তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড় বৃহৎ সংসারকে এত বড় ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়—ভীরু যে, পালাতে যে চায় সে কোথাও তাঁকে পায় না। সাহস করে বল্‌তে হবে এই যে তাঁকে পাচ্চি, এই যে এখনি, এই যে এখানেই—বারবার বলতে হবে আমার প্রত্যেক কর্ম্মের

মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্চি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্চি; কর্ম্মের মধ্যে আমার যা কিছু বাধা, যা কিছু বেসুর, যা কিছু জড়তা, যা কিছু অব্যবস্থা সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসঙ্কোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্ম্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করচেন।

উপনিষদে "ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠঃ" ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেচেন? আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না—সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ, তিনি কর্ম্ম না হলে বাঁচবেন

কি করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম্ম করতেই হবে যে কর্ম্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এই জন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর সকল কাজই হচ্চে পরমাত্মার মধ্যে; তাঁর খেলা, তাঁর স্নান আহার, তাঁর জীবিকা অর্জ্জন, তাঁর পরহিতসাধন সমস্তই হচ্চে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি "ক্রিয়াবান," ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্ম্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলি কর্ম্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্চে ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোট বড় সকল কাজেই, সত্যের দ্বারা

সৌন্দর্য্যের দ্বারা শৃঙ্খলার দ্বারা মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও ত আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করচেন—তিনি "বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করচেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন ত তিনি নিজেই, তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলি নানা আকারে দান করচেন। কাজ করচেন, তিনি কাজ করচেন—নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কি করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলি উৎসর্গ করচে, সেই ত তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ঐখানে—ঐখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তিযোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলি দান করতে

হবে। বেদে তাঁকে "আত্মদা বলদা" বলেছে — তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্ছেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্ছেন যাতে করে আমরাও তাঁর মত আপনাকে দিতে পারি। সেই জন্যে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্চেন ঋষি তাঁরই কাছে প্রার্থনা করচেন, সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু,—তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজনটা মেটান, আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধির যোগ সাধন করেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চলবে না যে, তাঁর শক্তিযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন, আমাদের শুভবুদ্ধি দিন তাহলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব, তাহলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভবুদ্ধি হচ্চে সেই বুদ্ধি যাতে সকলের স্বার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের

কর্ম্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভবুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম্ম কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম্ম নয়,—আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম্ম কিন্তু অভাব-তাড়িতের কর্ম্ম নয়,—তখন আমাদের কর্ম্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্ত্তন নয়। তখন, যেমন আমরা দেখচি "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ" বিশ্বের সমস্ত কর্ম্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্চে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্চে তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি, তাই আমার সকল কর্ম্মই শান্তিময় কল্যাণময় আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন তাঁর "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" তাঁর জ্ঞান, শক্তি এবং কর্ম্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমাশক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করচে—আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই

তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়; আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেন না হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাইনে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়—আপনার সমস্ত কর্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাইনে। কর্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিইনে বলে, দান করিনে বলে কর্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্মে তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে কর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মত তোমার দিকেই জ্বলে

উঠুক, নদীর মত তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক্, ফুলের গন্ধের মত তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্। জীবনকে তার সমস্ত সুখ দুঃখ, সমস্ত ক্ষয় পূরণ, সমস্ত উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালবাসতে পারি এমন বীর্য্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণ-শক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিতে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই বলে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মত এ'কে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্ব্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্ম্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে

প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্ব্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করচে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্ত্তগাড়ীকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুল্‌চে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়ুচে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করচে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলি কর্ম্মের রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করচে, সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্ব্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলি অভিশাপ দিচ্চে না।

যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্ম্মে মানুষের অনাস্থা সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে, সেই খানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ—সেইখানেই যত সঙ্কোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্ম্মণ, আজ আমরা তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ—বিশ্ব সংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখ-তাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমাসৃষ্টি চলচে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে

গৌরবান্বিত করেছ! সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবলবেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মত ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক, নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্ম্মরধ্বনিকে বহন করে—আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখাপল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক—আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্য্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক! দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহুতুলে আপনাকে একবার দিগ্বিদিকে ঘোষণা করুক্। মোহের আবরণকে উদ্ঘাটন কর, উদাসীনতার

নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও—এখনি এই মুহূর্ত্তে অনন্ত দেশে কালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্যবিলসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই, তারপরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক্ থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্য্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করচে; যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মত সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহানিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্চে।

আত্মবোধ

কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কি আমাকে বল্‌তে পার? একজন বল্লে, বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না। আর একজন বল্লে, "বলা যায় বৈ কি—কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জান্‌তে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন?" সে বল্লে, "যার পিপাসা হবে, সে গঙ্গার কাছে আপনি আস্‌বে।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তাই কি দেখ্‌তে পাচ্চ? কেউ কি আস্‌চে?"

সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বল্লে, "সবাই আসবে! সবাইকে আসতে হবে!"

আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ ত মিথ্যা বলে নি। আসচে, সমস্ত মানুষই আসচে! কেউ ত স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই ত সবাইকে চল্‌তে হচ্চে, আর যাবে কোথায়? আমরা প্রসন্নমনে হাসতে পারি—পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে করচি সবাই কেবল নিজের উদর পূরণের অন্ন খুঁজ্‌চে, নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারিদিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্চে? না, তা নয়। এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অন্নের জন্যে বস্ত্রের জন্যে, নিজের ছোট বড় কতশত দৈনিক আবশ্যকের জন্যে ছুটে বেড়াচ্চে—কিন্তু কেবল তার সেই আহ্নিক গতিতে নিজেকে প্রদক্ষিণ করা নয়—সেই

সঙ্গে সঙ্গেই সে জেনে এবং না জেনে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে মহাকাশে আর একটি কেন্দ্রের চারিদিকে যাত্রা করে চলেছে—যে কেন্দ্রের সঙ্গে সে জ্যোতির্ম্ময় নাড়ির আকর্ষণে বিধৃত হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে সে আলোক পাচ্চে, প্রাণ পাচ্চে, যার সঙ্গে একটি অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে তার চিরদিনের মহাযোগ রয়েছে।

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কি সেই প্রয়োজন ? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন, এবং বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্চে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে—আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড় আপন, তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকেই বিশুদ্ধ করে, প্রবল করে, পরিপূর্ণ করে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করচে।

শিশুকাল থেকেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে শিক্ষিত ও সংযত করচে, এক একটি বড় বড় লক্ষ্যের চারিদিকে সে আপনার ছোট ছোট সমস্ত বাসনাকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করচে, এমন সকল আচার অনুষ্ঠানের সে সৃষ্টি করচে যাতে তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্চে যে, দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে তার সমাপ্তি নেই, সমাজ ব্যবহারের মধ্যেও তার অবসান নেই। সে এমন একটা বৃহৎ আপনাকে চাচ্চে যে-আপনি তার বর্ত্তমানকে, তার চারিদিককে, তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোট নদীর ধারে এক সামান্য কুটীরে বসে এই আপনির খোঁজ করচে, এবং নিশ্চিন্ত হাস্যে বল্‌চে, সবাইকেই আস্‌তে হবে এই আপনির খোঁজ করতে। কেন না, এ ত কোনো বিশেষ মতের, বিশেষ সম্প্রদায়ের

ডাক নয়, সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে, এ যে তারি ডাক। কলরবের ত অন্ত নেই—কত কল কারখানা, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোলাহল আকাশকে মথিত করচে কিন্তু মানুষের ভিতর থেকে সেই সত্যের ডাককে কিছুতেই আচ্ছন্ন করতে পারচে না; মানুষের সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত অর্জ্জন বর্জ্জনের মাঝখানে সে রয়েছে; কত ভাষায় সে কথা কইচে, কত কালে কত দেশে কত রূপে কত ভাবে সমস্ত আশু প্রয়োজনের উপর সে জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করচে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করচে, কত বিকৃতি তাকে আক্রমণ করচে, কিন্তু সে বেঁচেই আছে—সে কেবলই বলচে, তোমার আপনিকেও পাও, আত্মানং বিদ্ধি।

এই আপনিকে মানুষ সহজে আপন করে

তুলতে পারচে না, সেই জন্যে মানুষ সূত্রচ্ছিন্ন মালার মত কেবলি খসে যাচ্চে, ধূলোয় ছড়িয়ে পড়চে। কিন্তু যে বিশ্বজগতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করচে সেই জগৎ ত মুহুর্মুহু এমন করে খসে পড়চে না, ছড়িয়ে পড়চে না।

অথচ এই জগৎটি ত সহজ জিনিষ নয়। এর মধ্যে যে সকল বিরাট শক্তি কাজ করচে তাদের নিতান্ত নিরীহ বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় যখন সামান্ত একটা টেবিলের উপর দু'চার কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের লীলা দেখতে যাই তখন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়, তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি যে কি অদ্ভুত এবং কি প্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে, আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত, এমন কত শত বাষ্প পদার্থ তাদের কত বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে কি কাণ্ড বাধিয়ে বেড়াচ্চে

তা আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। তার উপরে জগতের মূল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ। আকর্ষণের উল্টো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগের উল্টো শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই যে জগৎ, এখানকার আলোতে আমরা অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্চি, এবং জলে স্থলে অনায়াসে সঞ্চরণ করচি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতরটাতে কত রকমের কত কি কাজ চলচে তার ঠিকানা নেই কিন্তু আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড স্বাস্থ্যের মধ্যে এক করে জানচি—দেহটাকে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকযন্ত্র প্রভৃতির জোড়াতাড়া ব্যাপার বলে জানচিনে।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাত প্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ঙ্কর হোক্‌না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ জগৎটা আসলে

যে কি তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই—সেই সকল সূক্ষ্মতম মূল বস্তুর যোগবিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্চে। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই মূল বস্তুর দুর্গও আজ আর টেঁকে না। আদিকারণের মহা-সমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক এক পা এগচ্চে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্চে,—সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে 'সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠ্‌চে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যা এক-দিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর একদিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

সেই হচ্চে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জান্‌তে হচ্চে না—আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি,—জল স্থল তরু লতা পশু পক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের যোগবিয়োগ বা শক্তিবিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়—জল মানে আমারই এক্‌টি আপন সামগ্রী; সে আমার চোখের জিনিষ, স্পর্শের জিনিষ; সে আমার স্নানের জিনিষ, পানের জিনিষ; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্বজগৎ বল্‌তেও তাই;—স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কি তা আমরা ধারণা করতে পারিনে—কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে, যে, দুর্ব্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্ত মনে আপনার ধূলো-

খেলার ঘরের মত ব্যবহার করচে, কোথাও কিছু বাধ্‌চে না।

জড়-জগতে যেমন, মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কি তা কেমন করে বল্‌ব! পর্দ্দার উপর পর্দ্দা যতই তুল্‌ব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্ব্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব! সেই প্রাণ একদিকে যত বড় প্রকাণ্ড রহস্যই হোক্ না কেন, আর এক দিকে তাকে আমরা কি সহজেই বহন করচি—সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্ত্তে অগণ্য জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্চে, নূতন নূতন শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জ্জনতাকে সজন করে তুলচে—এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্য্যালোকে উঠ্‌চে এবং সূর্য্যালোক থেকে অন্ধকারে নেবে পড়চে! এ কি তেজ, কি বেগ,

কি নিশ্বাস মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্চে! যেখানে অতলস্পর্শ গম্ভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত, সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই, —আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জ্জিত উন্মথিত হয়ে উঠচে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে এক সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্চিনে। কিন্তু এখানেই সে আছে, এখনি সে আছে, আমার হয়ে আছে; তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ করে', তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে' সে আছে; সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বদ্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট্ মানবপ্রাণ তার পৃথিবীজোড়া ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিশ্বাস প্রশ্বাস, শীত গ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন, শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের জোয়ার ভাঁটা

নিয়ে দেশে দেশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাজ করচে। এই অনির্ব্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে আপন হ'য়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

তাই বলছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়া চলচে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দিয়েছে, তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করচি তা নয়, তাদের ভালবাসচি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাইনে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে ত এই রকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনি, সেখানে সে এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলতে পারচে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ডভাবে

সমগ্র করে', আপন করে লাভ করচে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন, তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কি কঠিন হয়েছে।

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারি মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পাচ্চে না—চারিদিকে সে কেবল টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিট্‌কে পড়চে। কিন্তু আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার—তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলি মনে হয় এটা পাইনি, ওটা পাইনি, ততক্ষণ যা কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেন না, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিষকেই পাইনে; এমন কোনো আধার থাকে না, যার মধ্যে কোনো কিছুকে স্থিরভাবে ধরে

রাখতে পারি। ততক্ষণ আমরা বলি সবই মায়া—সবই ছায়ার মত চলে যাচ্চে মিলিয়ে যাচ্চে। কিন্তু আত্মাকে যখনি পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব একককে যখনি নিশ্চিত করে ধরতে পারি তখনি সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারিদিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাইনি তখন যা কিছু অসত্য ছিল, আপনাকে পাবামাত্রই সেই সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে প্রবৃত্তির কাছে যারা মরীচিকার মত ধরা দিচ্চে অথচ দিচ্চে না, কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্চে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে; এই জন্যে যে লোক আত্মাকে পেয়েছে, জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্যরূপে পেয়েছে।

সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না, কারণ তার কাছে জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্য ধরা দিয়েছে; সে নিজে সত্য হয়েছে, এই জন্য তার কাছে কোন সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্ম-বোধের, আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায়নি, প্রাণ পায়নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না,

কিছুকেই ধরে রাখ্‌তে পারত না—তখন তার সৌন্দর্য্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনি জগতের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মাণিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম, প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারিদিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাইনে কিছুই দিইনে; যখনি সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনি আমি সত্য যে কি তা জানি, তখনি আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোট বড় সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়—তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্ম্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের

অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে—তখনি আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর আবর্ত্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান, তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনাটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে—অসংখ্যের ভিড় ঠেলে টানাটানি কাটিয়ে এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘট্‌বে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠ্‌বে।

এই জন্যে মানুষের সামঞ্জস্য বিশ্বজগতের সামঞ্জস্যের মত সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে বলেই নিজের ভিতরকার

সমস্ত বিরুদ্ধতাকে সে একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করে—বেদনার পীড়ায় সেইগুলোই তার কাছে অত্যন্ত বড় হয়ে ওঠে—নিজের ভিতরকার এই সমস্ত বিরুদ্ধতার দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে, এতেই তার চিত্ত প্রতিহত হয়—কোনো একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে যে এইসকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখবেদনার একটি আনন্দ-পরিণাম আছে এটা সে সহজে দেখ্‌তে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই দেখ্‌তে পাচ্চি যাতে আমার সুখ তাতেই আমার মঙ্গল নয়, যাকে আমি মঙ্গল বলে জান্‌চি চারিদিক থেকে তার বাধা পাচ্চি; আমার শরীর যা দাবি করে আমার মনের দাবি সকল সময় তার সঙ্গে মেলে না, আমি একলা যা দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে, আমার বর্ত্তমানের দাবি আমার

ভবিষ্যতের দাবিকে অস্বীকার করতে চায়। অন্তরে বাহিরে এই সমস্ত দুঃসহ বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চল্‌তে হচ্চে;—অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্যশক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করচে;—যাতে তার এই সমস্ত বিক্ষিপ্ততাকে মিলিয়ে এক করে দেবে সহজ করে দেবে তার প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষ্যকে কেবলি স্থির রাখবার চেষ্টা করচে। মানুষ আপনার অন্তর বাহিরের এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ ঐক্যসাধনের চেষ্টা প্রতিদিনই করচে,—সেই চেষ্টাই তার জ্ঞান-বিজ্ঞান সমাজ সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, সেই চেষ্টাই তার ধর্ম্মকর্ম্ম পূজা-অর্চ্চনা—সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্চে—সেই চেষ্টা খানিকটা সফল হচ্চে খানিকটা

নিষ্ফল হচ্চে, বার বার ভাংগচে বারবার গড়চে, ---কিন্তু বারম্বার এই সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ আপনার এই স্বাভাবিক ঐক্যচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার ভিতরকার সেই এককে ক্রমশ সুস্পষ্ট করে দেখ্‌চে—এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ এক তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌চে,—সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্চে ততই মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ভূমাকে আশ্রয় করচে।

তাই বল্‌ছিলুম, ঘুরে ফিরে মানুষ যা কিছু করচে---কখনো বা ভুল করে' কখনো বা ভুল ভেঙে---সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চাক্‌ না সত্য করে চাচ্চে এই আপ্‌নাকে, জেনে চাচ্চে, না জেনে চাচ্চে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাট ভাবে একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মানুষ আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে

পেতে চাচ্চে। সে এক রকম করে বুঝতে পারচে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়, নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসঙ্গীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা—সেই সঙ্গীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধ্‌চে, সুরের যতই স্খলন হোক্ তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্চে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলি বল্‌চে "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" সেই এককে জান, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ইহাই অমৃতের সেতু।

আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয়, যখন তার প্রবৃত্তি শান্ত হয় সংযত হয় তখন তার বুঝতে বাকি থাকে না এই তার এক কাকে খুঁজ্‌চে। তার প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে—কেন না নানা

বিষয়কে নিয়েই সে বাঁচে, নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার সার্থকতা। কিন্তু যেটি হচ্চে মানুষের এক, মানুষের আপনি—সে স্বভাবতই একটি অসীম এককে, একটি অসীম আপ্‌নিকে খুঁজ্‌চে—আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষৎ বলেন—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করচেন—"তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ" তাঁকে যে ধীবেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন, "তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং" তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর কারো না।

আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা, এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তি তর্কের দৃষ্টি নয়। এ হচ্চে "দিবীব

চক্ষুরাততং”—চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখ্‌তে পায় এ সেই রকম দেখা। আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্চে সে কোনো জিনিষকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্‌ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মত করে দেখে না—সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখ্‌তে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে বায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক করে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখ্‌তে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম্ম। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম আপনি। সেই পরম আপনিকে যদি আপন করেই না জানা যায়, তা হলে আর যেমন করেই জানা যাক্‌ তাঁকে জানাই হল না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না,

ঠিক উল্টো—জ্ঞান সহজেই তফাৎ করে জানে—আপন করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই।

উপনিষৎ বল্‌চেন—"এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা," —এই দেবতা বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্ম্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করচেন—কিন্তু তিনিই "মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" মহান্ আপনরূপে পরম একরূপে সর্ব্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতৎ"—সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান—যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন "অমৃতাস্তে ভবন্তি" তাঁরাই অমৃত হন।

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে,—মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের

জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে দিয়ে অনন্তকালেও আমরা একেকে পেতে পারিনে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্ত্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর কিছুতে পাবার জো নেই—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্চে প্রকাশ—এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়—আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুটতে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারে ঘা মারতে হবে না—যা কিছু বাধা আছে সেইগুলো কেবল মোচন করতে হবে—দরজা খুলে দিতে হবে, তাহলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

সেই জন্যেই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা—আবিরাবীর্ম্মএধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও! মানুষের যা দুঃখ সে অপ্রকাশের দুঃখ—যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনো তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্চেন না; তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে; এখনো তার মধ্যে বাধা-বিরোধের সীমা নেই; এখনো সে আপনার প্রকৃতির

নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারচে না, এখনো তার এক ভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করচে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্চে না, এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌চেনা ; ভয় দুঃখ শোক অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়চে, যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা, যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করচে, আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌চে না ; এই জন্যেই মানুষের প্রার্থনা,—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা কর। যেখানে সেই আবিঃর আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে প্রসন্নতা নেই ; যে দেশে সেই আবিঃর আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রসন্নতা চলে গেছে, যে গৃহে তাঁর আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধন

ধান্য থাকলেও শ্রী নেই, যে চিত্তে তাঁর প্রকাশ সমাচ্ছন্ন সে চিত্ত দীপ্তিহীন প্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল স্রোতের শৈবালের মত ভেসে বেড়াচ্চে।• এই জন্যে যে কোনো প্রার্থনা নিয়েই মানুষ ঘুরে বেড়াক্ না কেন তার আসল প্রার্থনাটি হচ্চে, আবিরাবীর্ম্মএধি, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক্। এই জন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড় কান্না, পাপের কান্না; সে যে আপনার সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম একের সুরে মেলাতে পারচে না, সেই অমিলের বেসুর, সেই পাপ তাকে আঘাত করচে; মানুষের নানা ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্চে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করচে তখন সে নিজেকে সেই পরম একের শাসনে বিধৃত দেখ্‌তে পাচ্চে না, তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে

উঠে সে বল্‌চে মামাহিংসী—আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না; বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, আমার সমস্ত পাপ দূর কর তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও, তাহলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠ্‌বে।

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়, তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের কিন্তু যে জাতি যে রকম পরিণতিই পাক্‌না কেন সকলেই কোনো না কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড় আপনাকে চাচ্চে। এমন একটি বড়, যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান

করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্চে, যা তার কেনাবেচার সামগ্রী তা নিয়ে ত তাকে থাকতেই হয়, সেই সঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখাশোনা খাওয়াপরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্চে, তাকেই আপনার সমস্ত সুখদুঃখের চেয়ে বড় বলে স্বীকার করচে। কেন না মানুষ জানচে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই; তার প্রতিদিনের খাওয়া পরা আরাম বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বলচে, আবিরাবীর্ম্মএধি—হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারচে যে, তার

মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে—তাকে মুক্ত করতে হবে, তাকে যুক্ত করতে হবে; সেই দিকে চেয়েই মানুষ একদিকে আপনার দীনতা আর একদিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চে এবং সেইদিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে—আবিরাবীর্ম্মএধি, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও! প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায়—ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখ্‌তে চায়,—তার পরম আপনকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি—এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণ, তার মনের মন, এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে

পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কি সেটা তাঁহারাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারিনে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলি সুগম করে দিচ্চেন—সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পারলেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলি বিশুদ্ধ করে তুলচেন—সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্চেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্ব্বতে জ্যোতিষ্ক-লোকে, বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মতন্ত্রের মধ্যে,

অসীমকে দেখি কিন্তু সেখানে আমরা অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখতে পাইনে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি, এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্চে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখতে পাই—কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখ্‌তে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখ্‌ব? ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি জগতে সে আর কোথায় দেখতে পাব? অগ্নি, জল, বায়ু, সূর্য্য তারা যত উজ্জ্বল যত প্রবল যত বৃহৎ হোক এই প্রকাশকে সে ত দেখাতে পারে না। তারা শক্তিকে দেখায় কিন্তু শক্তিকে দেখানর মধ্যে একটা বন্ধন একটা পরাভব আছে—তারা নিয়মকে দেখা-

মাত্র লঙ্ঘন করতে পারে না—তারা যা' তাদের তাই হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, কেন না তাদের লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। এমনতর জড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার আনন্দ পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন—এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন, সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেন না সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন—সেইখানেই সকলের চেয়ে বড় প্রকাশ—ইচ্ছার প্রকাশ প্রেমের প্রকাশ। সেখানে আমরা তাঁকে মান্‌তেও পারি, না মান্‌তেও পারি, সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁর ইচ্ছাকে

গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব সেই একটি মস্ত অপেক্ষা, একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্ব্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেন না, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপমলিনতার অবকাশ ঘটেছে—কেন না, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এতদূর পর্য্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকতেন তবে এমনটি ঘট্‌তে পারত না—বস্তুত সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন—সে জায়গা তিনি মানুষকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয়—কিন্তু না যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চল্‌তে

শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন এও সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্র-টুকুতে তিনি আছেন অথচ নেই। এই জন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করচি আঘাত পাচ্চি, ধূলায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠ্‌চে, সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে—আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক্! বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চল্‌তে চল্‌তে শোনা যায়—এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয় নি—সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সাধি গান,—

"মাঝি, তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না!" তোমার হাল তুমি ধর, এই তোমার জায়গায় তুমি এস, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠ্‌লুম না! আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখ না—হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক্‌!

এত বাধা বিরোধ এত অসত্য এত জড়তা এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়—কারণ, বাধা না হলে প্রকাশ হতেই পারে না;—জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুলচে—এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে যেখানে তাঁর প্রেমের মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি

স্বীকার করেছেন, সে হচ্চে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়—যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায় তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।

এই জন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্ত্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে সঙ্কোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়,আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ—তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে ; এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়—এখানে জোর খাটে না ;—রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না! প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এই জন্যে ভক্ত যে দিন

আপনার অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দেয়, ইচ্ছা করে' আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয় সেই দিন মানুষের মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্চেন। সেই জন্যেই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্য্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়চে—এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্চে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্চেন, সেই জন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্চে—বলচে আবিরাবীর্ম্ম এধি!

আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রের এই স্পর্দ্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজ কাল অন্য দেশের অন্য ভাষাতেও আভাস দিচ্চে।

সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখ্‌লুম—তিনি ভগবানকে ডেকে বলচেন—

Thou hast need of thy meanest creature ;
  thou hast need of what once was thine :
The thirst that consumes my spirit
  is the thirst of thy heart for mine.

তিনি বলচেন, তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার প্রয়োজন আছে ; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও ; আমার চিত্তকে যে তৃষায় দগ্ধ করচে—সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্যে তোমার হৃদয়ের তৃষা।

পশ্চিম হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি—তাঁর নাম জ্ঞানদাস বঘেলি—তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন—আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন—

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
বহ প্রভু অসীম ভাষায়,
(তাই দীননাথ) আমি ক্ষুধিত, আমি তৃষিত,
তাইতো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা, তাই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্চে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করচেন—সেই ভাষাই ত উষার আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার ত আর কোনোই কাজ নেই সে ত কেবলি হৃদয়ের প্রতি হৃদয়-মহাসমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরাম দাসের ভাষায় বল্‌চে—"তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির"—তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে—সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এস, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এস—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের

মিলন সম্পূর্ণ হোক্!—এই একটি বিরহবেদনা অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেই জন্যেই আমার মধ্যেও আছে।

I have come from thee,—why I know not;
But thou art, O God! what thou art;
And the round of eternal being is the
pulse of thy beating heart.

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি, কেন যে তা জানিনে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ; এই যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগযুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা এই হচ্চে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।

অনন্তের মধ্যে এই যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে রচনা করে তুল্‌চে—কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বল্‌চেন এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ করব—এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার; তাই কবি

বল্‌চেন, আমি যে দুঃখ পাচ্চি তাতে তুমি লজ্জা কোরো না, প্রভু!

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কি স্বামী!
তোমার সকল ব্যথার ব্যথী আমায়
কোরো নিশিদিন!
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব!
বিশ্ব তোমার বিরাট গেহ
আমিও বিশ্বে লীন।

ভোগের সুখ ত আমি চাইনে—যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো,—আমি যে তোমার পত্নী—আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব; সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব —আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেই জন্যেই, আমি বল্‌চিনে

আমাকে সুখ দাও—আমি বল্‌চি, আবিরাবীর্য্যএধি—হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও!

আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী
ভোগের দাসী নহি।
আমার আছে লাজ কি স্বামী
নিষ্কপটে কহি।
আমায় প্রভু দেখাইয়োনা
সুখের প্রলোভন,
তোমার সাথে দুঃখ বহি
সেই ত পরম ধন।
ভোগের দাসী তোমার নহি
তাই ত ভুলাও নাকো,
মিথ্যা সুখে মিথ্যা মানে
দূরে ফেলাও নাকো।
পতিব্রতা সতী আমি
তাই ত তোমার ঘরে

হে ভিখারী, সব দারিদ্র্য
আমার সেবা করে !
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই
পাইনা সুখের দান,—
আমি তোমার প্রেমের পত্নী,
এই ত আমার মান ॥

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না—তখন সে বলে "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং" যা ভূমা তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায়—তখন আর আরামকে চাইলে চল্‌বে না, স্বার্থকে চাইলে চলবে না, তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই, তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না—তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে,

তখন কর্ম্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই—তখন ভক্ত বিশ্ববোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

ভক্তের জীবনের মধ্যে যখন সেই প্রকাশকে আমরা দেখি তখন কি দেখি? দেখি, সে তর্কবিতর্ক নয়, সে তত্ত্বজ্ঞানের টীকা-ভাষ্য বাদপ্রতিবাদ নয়—সে বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়—সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না—সেও তেমনি; ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখ্‌তে পাইনে—তার আগাগোড়াই সেই একের মধ্যে সুন্দর হয়ে মহৎ হয়ে শক্তিশালী হয়ে মেলে। জ্ঞান

মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম্ম মেলে; বাহির মেলে, অন্তর মেলে; কেবল যে সুখ মেলে তা নয়, দুঃখও মেলে; কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে; কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে; সমস্তই আনন্দে মিলে যায়; রাগিণীতে মিলে ওঠে; তখন জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে নিটোল অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্ব্বচনীয় রূপ হচ্চে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে সুখ এবং দুঃখ দুই-ই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুই-ই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুই-ই সার্থক;—এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মত, মধুর সুরে বাজ্‌তে থাকে;—এই প্রেমের মৃদুতাও যেমন সুকুমার, বীরত্বও তেম্‌নি সুকঠিন; এই প্রেম, দূরকে এবং নিকটকে, আত্মীয়কে এবং

পরকে, জীবন-সমুদ্রের এপারকে এবং ওপারকে প্রবল মাধুর্য্যে এক করে দিয়ে, দিগ্‌দিগন্তরের ব্যবধানকে আপন বিপুল সুন্দর হাস্যের ছটায় পরাহত করে দিয়ে উষার মত উদিত হয়; অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন; পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তার সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে;—তখন অসীমে সসীমে যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ কেবলি অমৃতে ভরে ভরে উঠ্‌তে থাকে, সেই ফাঁক-টুকুর ভিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত আপনার পাপ্‌ড়ি একটির পর একটি ক'রে বিকশিত করতে থাকে—তখন জগতের সকল প্রকাশ, সকল আকাশের সকল তারা, সকল ঋতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে বাঁশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে,—তখন হে রুদ্র, হে চিরদিনের পরম দুঃখ, হে চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা, তোমার এ কী মূর্ত্তি! এ কী

দক্ষিণং মুখং! তখন তুমি নিত্য পরিত্রাণ করচ, সসীমতার নিত্য দুঃখ হতে নিত্য বিচ্ছেদ হতে তুমি নিত্যই পরিত্রাণ করে চলেছ এই গূঢ় কথা আর গোপন থাকে না! তখন ভক্তের উদ্‌ঘাটিত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মানব-লোকে তোমার সিংহদ্বার খুলে যায়—ছুটে আসে সমস্ত বালক বৃদ্ধ—যারা মূঢ় তারাও বাধা পায় না—যারা পতিত তারাও নিমন্ত্রণ পায়—লোকাচারের কৃত্রিম শাস্ত্রবিধি টলমল্ করতে থাকে এবং শ্রেণীভেদের নিষ্ঠুর পাষাণ-প্রাচীর করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে। তোমার বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্চে যে, "আমি তোমার", এই কথা বলে' সে নতশিরে তোমার নিয়ম পালন করে চল্‌চে—মানুষ তার চেয়ে ঢের বড় কথা বলবার জন্য অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—সে বল্‌তে চায় "তুমি আমার" ;—কেবল তোমার মধ্যে আমার স্থান তা নয়, আমার মধ্যেও

তোমার স্থান; তুমি আমার প্রেমিক, আমি তোমার প্রেমিক;—আমার ইচ্ছায় আমি তোমার ইচ্ছাকে স্থান দেব, আমার আনন্দে আমি তোমার আনন্দকে গ্রহণ করব এই জন্যেই আমার এত দুঃখ, এত বেদনা, এত আয়োজন; এ দুঃখ তোমার জগতে আর কারো নেই; নিজের অন্তর বাহিরের সঙ্গে দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর কেউ বলচে না আবিরাবীর্ম্মএধি—তোমার বিচ্ছেদবেদনা বহন করে জগতে আর কেউ এমন করে কাঁদ্‌চে না যে,মামাহিংসীঃ; তোমার পশু পক্ষীরা বল্‌চে আমার ক্ষুধা দূর কর, আমার শীত দূর কর, আমার তাপ দূর কর; আমরাই বলচি—বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—আমার সমস্ত পাপ দূর কর। কেন বলচি? নইলে, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন না হওয়ার যে দুঃখ সে দুঃখ কেবল আমার নয়, সে দুঃখ

অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই জন্যে, মানুষ যে দিকেই ঘুরুক্ যাই করুক্ তার সকল চেষ্টার মধ্যেই সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে, আবিরাবীর্ম্মএধি। এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়—আরাম ঐশ্বর্য্যের পুষ্পশয্যার মধ্যে শুয়েও সে ভুলতে পারে না, দুঃখ যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভুলতে পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত সুখ দুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও,—সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগযুগান্তরের উপরে নিস্তব্ধ বিরাজমান যে পরম এক তুমি, সেই মহা এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও, সেই এক তুমি পিতানোসি, আমার পিতা, সেই এক তুমি পিতা নো বোধি,

আমার বোধের মধ্যে আমার পিতা হও, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে প্রভু হও, আমার প্রেমের মধ্যে প্রিয়তম হও, এই প্রার্থনা জানাবার যে গৌরব মানুষ আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে বহন করেছে, এই প্রার্থনা সফল করবার যে গৌরব আপন ভক্ত-পরম্পরার মধ্য দিয়ে কত কাল হতে লাভ করে এসেছে—মানুষের সেই শ্রেষ্ঠতম গভীরতম চিরন্তন গৌরবের উৎসব আজ এই সন্ধ্যাবেলায়, এই লোকালয়ের প্রান্তে, অন্ধকার পৃথিবীর নানা জন্মমৃত্যু, হাসিকান্না, কাজকর্ম্ম, বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনটিতে; —মানুষের সেই গৌরবের আনন্দধ্বনিকে আলোকে, সঙ্গীতে, পুষ্পমালায়, স্তবগানে উদ্বোধিত করবার এই উৎসব। বিশ্বের মধ্যে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, মানুষের ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং এই কথা জান্‌তে

এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি—তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়—আনন্দের দ্বারা—শিশু যেমন সহজবোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেই রকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বারা। হে উৎসবের অধিদেবতা, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই উৎসবকে সফল কর, এই উৎসবের মধ্যে, হে আবিঃ, তুমি আবির্ভূত হও, আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্তাকাশে তোমার দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হোক্, প্রতিদিন আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জেনে যে দুঃখ পেয়েছি, সেই বোধ হতে সেই দুঃখ হতে এখনি আমাদের পরিত্রাণ কর—সমস্ত লোভ ক্ষোভের ঊর্দ্ধে ভূমার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করে' বিশ্বমানবের বিরাট্ সাধনমন্দিরে আজ এখনি তোমাকে নত হয়ে নমস্কার করি—নমস্তেঽস্তু—তোমাতে আমাদের নমস্কার সত্য হোক্, নমস্কার সত্য হোক্!

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

একটি গান যখনি ধরা যায় তখনি তার রূপ প্রকাশ হয় না—তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কি এবং তার অন্তরাটা কোন্‌দিকে গতি নেবে সে কথা চিন্তা করবার সময় আসে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা সমে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁচেছে। যে-সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল—ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই যে আঘাত দেবার কাজ, এ একটা সময়ে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে—হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে পারে না, এই চেষ্টা নানা ঘাত প্রতিঘাত ও সত্য মিথ্যার ভিতর দিয়ে ঘুরে নানা শাখা প্রশাখার পথ খুঁজ্‌তে খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাচ্চে যার মধ্যে সত্যের মূর্ত্তি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্চেনা—কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে,—হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে।

এই চিত্ত যখন জেগেছে তখন হিন্দুসমাজ আর ত অন্ধভাবে কালের স্রোতে ভেসে যেতে

পারেনা—তাকে এখন থেকে দিক্‌নির্ণয় করে চল্‌তেই হবে, নিজের স্থানটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ভুল অনেক করবে কিন্তু ভুল করবার শক্তি যার হয়েছে ভুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বল্‌ছিলুম্‌ ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের কাজটা সমে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়েছে? যে পথিকরা পান্থশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের দ্বারে আঘাত করেই কি সে চলে যাবে—কিম্বা জাগরণের পরেও কি সেই দ্বারে আঘাত করার বিরক্তিকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না? এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবে না?

নিরুদ্ধ উৎসের বাধা দূর করবার জন্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটি খোঁড়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাজটা বিশেষভাবে আমারই। সেই

খননকরা কূপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি—কিন্তু যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বেরিয়ে পড়ে, তখন কোদাল ফেলে দিয়ে সেই গর্ত্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে ঝরণাটা দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিষ—তার উপরে আমারই শিলমোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে—তখন আমরাই তার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এই রকম দুই অধ্যায় আছে। যত দিন বাধা দূর করবার পালা, ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব; ততদিন আমাদের কাজ চারিদিক থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন কি, চারিদিকের বিরুদ্ধ, ততদিন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত তীব্র।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছন যায় যেখানে বিশ্বের মর্ম্মগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিষ সকলেরই জিনিষ—সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে আঘাতের কাজ বন্ধ-রেখে নিজেকে তারই অনুবর্ত্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষ্য-পরিবর্ত্তন হয়, তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে, পদে পদে আপনাকেই তীব্রভাবে অনুভব করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থ-কতার সম্মুখে এসে পৌঁছে নিজের এতদিনকার সমস্ত ভাঙাগড়ার চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্তক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি?

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক্ থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্ব্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিনব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল, তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবী-ব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল। সেই সঙ্কটের সময়ে অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয়নি।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকেও দেখা যেতে

পারে ব্রাহ্মসমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্চি এবং সামাজিক কর্ত্তব্যসাধন করে উপকার পাচ্চি এইটুকুমাত্র স্বীকার করেই থাম্‌তে পারিনে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড় করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয় সাধনের বর্ত্তমান-কালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারত-বর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্ম্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনি প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনি আপনার সকলের চেয়ে সত্য-সাধনাকেই, ব্রহ্মসাধনাকেই, নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমানধর্ম্ম প্রবল ধর্ম্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম্ম নয়। এই ধর্ম্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহুশতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল, তখনকার ধর্ম্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে

পাইনে। কারণ সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই মুসলমান অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখ্‌লে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমানধর্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি, হয়, আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয়, আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক, রবিদাস, কবীর দাদু প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা

আলোচনা করচেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ সম্বন্ধে কি রকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান-ধর্ম্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল ভারতবর্ষের মর্ম্ম-স্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এই জন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক্ তার মর্ম্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাশ্চাত্যজগতের সত্য আপনার জয়ঘোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে, না, শত্রুর আঘাত হবে? প্রথম

যেদিন সে শৃঙ্গধ্বনি করে এসেছিল সেদিন ত মনে করেছিলুম সে বুঝি মৃত্যুবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা মনে করেছিল ভারতবর্ষের সত্যসম্বল নেই অতএব এইবার তাকে তার জীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি!

কিন্তু তা হয় নি। পৃথিবীর নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহুদিনের অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধনভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে—ভয় নেই, কোনো অভাব নেই—এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দ-ভোজে পূর্ব্ব পশ্চিম এক পংক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার-উদ্‌ঘাটনই ব্রহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য। অনেক দিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, তালায় মরচে

পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ায় খোলবার সময় কঠিন ধাক্কা দিতে হয়েছে, সেটাকে যেন বিরোধের মত বোধ হয়েছিল।

কিন্তু বিরোধ নয়। বর্ত্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনো এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার সকল জটিলতার যথার্থ সমাধান করে দেবে এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠ্‌চে।

ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব ইতিহাসের এই

বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বলতে যে কি বোঝায় উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,—
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই মোটা কথাটা বলে

নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়—এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি জল তরুলতাকে আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে—আমাদের চৈতন্য সেখানে পরমচৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করচে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র জানা নয়, সর্ব্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্চে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকে ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা; জীবনের

এমন পরিপূর্ণতা, জগদ্বাসের এমন সার্থকতা আর কি হতে পারে !

কালের বহুতর আবর্জ্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে জিনিষ ত একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। তাঁকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা এই ব্রহ্মসাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখ্‌লে মনুষ্যত্বের কোনো একটা চরম তাৎপর্য্য থাকে না—সে একটা পুনঃ-পুনঃ আবর্ত্তমান অন্তহীন ঘূর্ণার মত প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ পেয়েছিল মাঝে তাকে হারাতে হয়েছে। কারণ, পুনর্ব্বার তাকে বৃহত্তর করে পূর্ণতর করে পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল—সেইটিকে শোধন করে নেবার জন্যেই তাকে হারাতে হয়েছে। একবার তার কাছে থেকে দূরে

না গেলে তাকে বিশুদ্ধ করে সত্য করে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলুম কেন? আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে অন্তর ও বাহির, আত্মার দিক্ ও বিষয়ের দিক্ সমান ওজন রেখে চল্‌তে পারেনি। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলুম—তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম—তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে পর্য্যন্ত একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্য্যাপ্ত করে তুল্‌তে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল, ভক্তি তখন বিচিত্র কর্ম্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিষ জড় নয় সে কেবলমাত্র

আপনাকে নিয়ে টিকতে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য খুঁজতে হয়। জীব যখন খাদ্যাভাবে নিজের চর্ব্বি ও শারীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে কিন্তু ক্রমশই নীরস ও নির্জ্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তি হৃদয়বৃত্তিও কেবল আপনাকে আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না— আপনাকে পোষণ করবার জন্যে রক্ষা করবার জন্যে আপনার বাইরে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জ্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল—এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিতে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে চলছিল। সে বিষয়রাজ্যের বৈচিত্র্যের

মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপকার করে তুলছিল—তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই সংগ্রহ, কাজের উত্তেজনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্যরাজ্যে য়ুরোপ গভীরতম চরম ঐক্যটি পায়নি বটে, তবু তার সর্ব্বব্যাপী একটি বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বাঁধা ;—কোথায় বাঁধা, কার হাতে বাঁধা—এই সমস্ত বন্ধন কোন্‌খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্য্যবসিত য়ুরোপ তা দেখেনি।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত

শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্ব্বাসিত করে রাখেননি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্বইতিহাসে বিশ্বধর্ম্মে বিশ্বকর্ম্মে সর্ব্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনি উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরম-জ্ঞানীর অতি দূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারিদিকে রাজত্ব করছিল আচার-বিচার-বাহ্যঅনুষ্ঠান এবং ভক্তি-রস-মাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসাধনকে পুঁথির অন্ধকারসমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠ্‌ল এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ পিতামহের সামগ্রী নয়, বলে উঠ্‌ল এ খৃষ্টানি, এ'কে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্যগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায়

তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন কি সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এদিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করচে। কিন্তু সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্চে, আপনার চেয়ে বড়কে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্ম্মের ক্ষেত্র পৃথিবীজোড়া, এবং সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূর-বিস্তৃত। কিন্তু তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল "আমি," তার মন্ত্র ছিল জোর যার মুলুক তার; সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তিদেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউবা বলে স্বাজাত্য, কেউবা বলে

রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউবা বলে অধিকাংশের সুখ-সাধন, কেউবা বলে মানবদেবতা। কিন্তু কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে, এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসচে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলচে— কিন্তু একথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না;—প্রয়োজনবোধকে যত বড় নাম দেও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড় সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্য-প্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্য্যন্ত কিছুই

টিকতে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবন-সূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাত-বেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্ব্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্ব্বতো-ভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্চে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই

ইতিহাসের ধারা কখনো দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকান্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু কখনই শুষ্ক হয়নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি—কিন্তু তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোট করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি, যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্ক তুষার-স্রুত এই পুণ্য স্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়চে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ কর্‌চে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে

জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্ম্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্য্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।